সাম্যবাদ

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন কার স্বার্থে? ৩

বন্ধ ঘোষিত চিনিকল চালু এবং চিনিকল শ্রমিক ও আখচাষিদের জীবন-জীবিকা রক্ষায় 'জাতীয় কনভেনশন ২০২১' ৫

করোনা মহামারীতে মহান মে দিবসের তাৎপর্য অপরিসীম ৬

মায়ানমারে সেনা অভ্যুত্থান বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলন ৬

web: www.spbm.org বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)'র মুখপত্র, ৮ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, এপ্রিল-মে ২০২১, মূল্য ৫ টাকা

সুনামগঞ্জের শাল্লায় হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর হামলাসহ সকল সাম্প্রদায়িক নিপীড়নের বিচার চাই

রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হোন

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল(মার্কসবাদী)-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী ২১ মার্চ এক বিবৃতিতে হেফাজতে ইসলাম নেতা মাওলানা মামুনুল হকের বিরুদ্ধে ফেসবুকে লেখার 'অপরাধে' সুনামগঞ্জের শাল্লায় হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর হামলা-ভাঙ্গচুর-লুটপাটের ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন এবং নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে হামলার উস্কানিদাতা ও জড়িতদের গ্রেপ্তার-বিচার দাবি করেছেন।

বিবৃতিতে কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী বলেন, "বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও তাদের দোসরদের হাতে সবচাইতে বেশি হত্যা-নির্যাতন-ধর্ষণের শিকার হয়েছিল হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষেরা। এদেশের স্বাধীনতার জন্য সর্বাধিক ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন তাঁরা। অথচ আজ আওয়ামী লীগ সরকার যখন সাড়ম্বরে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী পালন করছে, তখনো এদেশে হিন্দুসহ সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায় ও জাতিসত্তার মানুষরা নিরাপদ নয়। শুধুমাত্র ধর্মীয় ও জাতিগত পরিচয়ের কারণে তাঁদের গণহারে আক্রমণ ও বৈষম্যের শিকার হতে হচ্ছে। কেউ যদি ভুল বা অন্যায় কথাও বলে বা লেখে, তার জন্য তাকে তাৎক্ষণিক শাস্তি দিতে তার বাড়িঘরে হামলা করার অধিকার কারো নেই। দেশে আইনের শাসন থাকলে এধরণের ধর্মান্ধ ও উগ্র জনতাকে প্রতিহত করার দায়িত্ব সরকারের। অথচ, আমরা দেখতে পাচ্ছি হেফাজতে ইসলামের পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধের চেতনার দাবিদার সরকারি দলের লোকেরা শাল্লার আক্রমণের সাথে যুক্ত। ক্ষমতার রাজনীতির স্বার্থে আওয়ামী লীগ সরকারের হেফাজতে ইসলামসহ মৌলবাদী শক্তির সাথে আঁতাতের পরিণতিতে তারা সারাদেশে নির্বিঘ্নে ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা ও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের বিস্তার ঘটাচ্ছে। এই সরকারের আমলে কক্সবাজারের রামু, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগর, কুমিল্লার মুরাদনগরসহ অসংখ্য সাম্প্রদায়িক হামলার ঘটনা ঘটেছে যার উপযুক্ত বিচার ও অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হয়নি। এদিকে, মুক্তিযুদ্ধের ধর্মনিরপেক্ষ চেতনাকে পদদলিত করে আওয়ামী লীগ

● ২ এর পাতায় দেখুন

সরকারের লকডাউনের ঘোষণা অপরিকল্পিত ও পূর্বপ্রস্তুতিহীন

করোনা ভাইরাস সংক্রমণের বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে শ্রমজীবি জনগণের ঘরে ঘরে খাদ্য ও নগদ অর্থ পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা না করে সরকারের লকডাউন ঘোষণা অপরিকল্পিত ও পূর্বপ্রস্তুতিহীন।

করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ও মৃত্যুর হার বাড়ার প্রেক্ষিতে আকস্মিকভাবে সরকার আগামী সোমবার থেকে একসপ্তাহ লকডাউনের ঘোষণা দিয়েছে। কোন পূর্বপ্রস্তুতি ও পরিকল্পনা ছাড়া লকডাউন ঘোষণা করায় জনগণ চরম দুর্ভোগ ও উদ্বেগে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। বাড়ি ফেরার তাগিদে লঞ্চ ও বাস টার্মিনালে মানুষের হুমড়ি খেয়ে পড়ার চিত্রেই তা স্পষ্ট। লকডাউনের সময়সীমা সম্পর্কে সরকারের অস্পষ্ট অবস্থান জনগণের অনিশ্চয়তা আরো বাড়িয়েছে। ১৪ দিনের নীচে লকডাউন অবৈজ্ঞানিক, ফলে লকডাউনের সময় বাড়ানো হবে কি'না, তা স্পষ্ট করে সরকার বলছে না, প্রয়োজনে বাড়ানো হতে পারে বলে বলা হচ্ছে। সংক্রমণের ঝুঁকি কমাতে জনগণের চলাচল কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করার কথা বলে, ৪০ লক্ষ গার্মেন্টস শ্রমিককে উৎপাদনের কাজে নিয়োজিত রাখার সিদ্ধান্তে জনস্বাস্থ্যবিদদের পরামর্শের চাইতে মালিকের স্বার্থকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে, তা স্পষ্ট। দেশের ৬ কোটি শ্রমশক্তির সাড়ে ৫ কোটি ২০ লাখ মানুষই অপ্রাতিষ্ঠানিক সেক্টরে কাজ করে। দৈনিক আয়ের উপর নির্ভরশীল এসব শ্রমিক কাজ না করলে, তাদের আয় ও খাবার বন্ধ।

লকডাউনের এক সপ্তাহ বা সময় বাড়ানো হলে, এ-সময় সাধারণ এ শ্রমজীবি মানুষেরা কি খেয়ে থাকবে, তাদের ঘরে ঘরে সরকারের পক্ষ হতে লকডাউন চলাকালীন সময়ের জন্য খাদ্য ও অর্থ পৌঁছে দেওয়া হবে কি'না – সে বিষয়ে কোন বক্তব্য ও পরিকল্পনা আছে বলে সরকার জানায়নি।

সরকারের পক্ষ হতে খাদ্য ও অর্থের ব্যবস্থা না করে লকডাউন ঘোষণা যে সাধারণ শ্রমজীবিমানুষকে অবর্ণনীয় দুর্দশায় নিক্ষেপ করে, গত বছর তা আমরা দেখেছি। ক্ষুধার্ত, কর্মহীন মানুষ সরকারি ত্রাণের জন্য জেলায় জেলায় করোনার ঝুঁকি উপেক্ষা করে হাজারে হাজারে বিক্ষোভ করেছে। এবারও সে পরিস্থিতি তৈরি হতে চলেছে।

বাংলাদেশে করোনা সংক্রমণের দ্বিতীয় ঢেউ আসছে, এ বিষয়ে ছয় মাস আগে থেকেই জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা সরকারকে বার বার সতর্ক করেছেন। জানুয়ারিতে এদেশে করোনা ভাইরাসের

● ২ এর পাতায় দেখুন

সরকারি হাসপাতালে কোভিড ওয়ার্ডে বেড ও আইসিইউ বেডের সংখ্যা বৃদ্ধির দাবিতে বাসদ(মার্কসবাদী)-র সমাবেশ

সরকারি হাসপাতালে কোভিড ওয়ার্ডে বেড ও আইসিইউ বেডের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং হাসপাতালের ইমার্জেন্সিতে পর্যাপ্ত অক্সিজেন সিলিন্ডার, ট্রলি, হুইল চেয়ার সরবরাহ ও জনবল বৃদ্ধির দাবিতে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতা?লের বহির্বিভাগের সামনে বাসদ (মার্কসবাদী) ঢাকা নগর শাখার সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। পার্টি ঢাকা নগরের ইনচার্জ নাঈমা খালেদ মনিকার সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন নগর কমিটির সদস্য মাসুদ রানা। সমাবেশ পরিচালনা করেন সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট ঢাকা নগর শাখার সভাপতি রাফিকুজ্জামান ফরিদ।

বক্তারা বলেন, "দেশে করোনার সংক্রমণ বাড়ছে, বাড়ছে মৃত্যুর মিছিল। অথচ বাড়েনি জনগণের প্রয়োজন অনুযায়ী সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসার আয়োজন। সারা দেশে কোভিড ডেডিকেটেড বেডের সংখ্যা সরকারি বেসরকারি মিলে ৩৪৩৯ টি। প্রথম আলোয় প্রকাশিত তথ্যমতে গত একমাসে কোভিড

সনাক্ত হয়েছে ১ লক্ষ ৮ হাজার ১০৩ টি। এ হিসেবে পরিস্থিতিতে ৩১.৪ জনের বিপরীতে একটি বেড বরাদ্দ আছে। পূর্বের পরিসংখ্যান মতে ডঐঙ বলে সংক্রমিত রোগীর মধ্যে ২০% রোগীর আইসিইউ সাপোর্ট লাগে। এর মধ্যে ১৫% এর লক্ষণ খারাপ এবং ৫% ক্রিটিকেল পরিস্থিতিতে পরে। সে হিসেবে আমাদের দেশে আইসিইউ থাকা প্রয়োজন ২০ হাজার বেডের অধিক। অথচ আমরা দেখছি এ সংখ্যক কোভিড ডেডিকেটেড

● ২ এর পাতায় দেখুন

নরেন্দ্র মোদীর সফরের প্রতিবাদে আন্দোলনে দমন-পীড়ন ও আওয়ামী ফ্যাসিবাদকে পাকাপোক্ত করার কৌশল

মোদী এসেছিলেন রক্তাক্ত পথ ধরে, তাই তার যাওয়ার পথের দিকে কেউ তেমন দৃষ্টি দেয়নি। তাকে কেউ চায়নি, কিন্তু তিনি এসেছেন। প্রশ্ন জাগে, এই নাছোড়বান্দা আগমনে বাংলাদেশের উপকার কিছু হল কী?

সরকারি ও দলদাস বুদ্ধিজীবীরা মতামত তৈরির উদ্দেশ্যে এই প্রোপাগান্ডা করছেন যে, এটা একটা আনুষ্ঠানিকতা মাত্র। দেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উৎসবে প্রতিবেশী দেশের প্রধান নির্বাহীকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে রেওয়াজ অনুসারে। তিনি সেই দেশের নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী। তিনি মোদী না হয়ে যে কেউ হতে পারতেন। আমরা ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ জানাইনি, জানিয়েছি রাষ্ট্রকে। রাষ্ট্রের প্রতিনিধি হিসেবে মোদী এসেছেন। এটাতে সরকারের কোন হাত নেই। এর বিরুদ্ধে বিক্ষোভও তাই অবান্তর।

তর্কের খাতিরে কথাটাকে সত্য ধরে নেই। তাহলে এই প্রশ্ন জাগে, ভারতের প্রধান নির্বাহীর আগমন তো নিছক বেড়ানো নয়। যে কোন দেশের প্রধান নির্বাহীর আগমন মানেই দ্বিপাক্ষিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা ও কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ। ভারতের ক্ষেত্রে এই বিষয়টি আরও গুরুত্বপূর্ণ, কারণ অন্য যে কোন দেশের তুলনায় ভারতের সাথেই বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক স্বার্থ সবচেয়ে বেশি জড়িত।

এই প্রেক্ষিতে মোদির সফরকে আমরা একটু পর্যালোচনা করি। এ সফরে পাঁচটি দ্বিপাক্ষিক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। এগুলো হলো - দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, সহনশীলতা ও প্রশমন, দুই দেশের জাতীয় ক্যাডেট কোর বিষয়ক, দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক প্রতিকারে সহযোগিতার ফ্রেমওয়ার্ক স্থাপন, বাংলাদেশ-ভারত ডিজিটাল পরিষেবা, আইসিটি সরঞ্জাম সরবরাহ, রাজশাহী কলেজে ক্রীড়া সুবিধা প্রদান ইত্যাদি। দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক প্রতিকারে ফ্রেমওয়ার্ক ছাড়া বাকিগুলোর গুরুত্ব নিয়ে আমাদের বলার কিছুই নেই। দুর্যোগ, ক্যাডেট কোর, আইসিটি ও খেলার সরঞ্জাম নিয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সাথে সময়ক্ষেপণ করে বৈঠকের কোন উপযোগিতা আছে বলে আমরা মনে করি না।

আবার বাণিজ্য নিয়ে যে আলোচনা হলো সেখানে কাদের স্বার্থ জড়িত? দুই দেশের মধ্যে যে বাণিজ্য ঘাটতি সেটা কিভাবে কমানো যায় সে নিয়ে আলোচনা হল। আলোচনা হল ভারত-মিয়ানমার-থাইল্যান্ড ত্রিদেশীয় হাইওয়ে বিষয়ে। আলোচনা হল ভারতের করিডোর ব্যবহার করে নেপাল ও ভুটানের সাথে বাংলাদেশের যোগাযোগ কিভাবে হতে পারে তা নিয়ে। বিশেষ করে চিলাহাটি-হলদিবাড়ি হয়ে ভুটানে পৌঁছার জন্য ভারতীয় ভূমি ব্যবহারের ব্যাপারে পদক্ষেপ নিতে নরেন্দ্র মোদীকে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বিশেষভাবে অনুরোধ করলেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন ২৭ মার্চ রাতে

● ২ এর পাতায় দেখুন

সরকারি হাসপাতালে কোভিড

বেডও নেই। ঢাকায় সরকারি হাসপাতালে আইসিইউ বেড ৩২২ ও ঢাকার বাইরে সারা দেশে ১১০ টি। বেসরকারি হাসপাতালের চিকিৎসা সাধারণ জনগণের নাগালের বাইরে। বেসরকারি হাসপাতালে আইসিইউ বেড মানে একটা ব্যবসা। এও ঠিক আইসিইউ পরিচালনার জন্য পর্যাপ্ত ডাক্তার-নার্স ও সাপোর্টিং স্টাফদের সুরক্ষা নিশ্চিত করে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়নি। তাই করোনার প্রথম ঢেউয়ে মৃত্যুর মিছিলে অনেক ডাক্তার ও নার্সরাও আছেন। আমাদের প্রশ্ন, দেশের জনস্বাস্থ্যকে গুরুত্ব দিতে সরকারের পরিকল্পনা কী? এ বৈশ্বিক মহামারি আমাদের দেশের চিকিৎসার ভঙ্গুর দশা প্রকাশিত করেছে। সবচেয়ে ন্যাক্কারজনক সরকারের মন্ত্রীসহ দায়িত্বশীলদের অবহেলা, দায়িত্বহীনতা ও দুর্নীতি। আমরা এর আগেও দেখেছি যে কোনো সংকটজনক পরিস্থিতিতে জনগণের পকেট কেটে কপদর্ক শূণ্য করে সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানসমুহ। পুরো চিকিৎসা সেক্টরের প্রধান ধারা প্রাইভেট হসপিটাল, ক্লিনিক, ল্যাব-ডায়গনস্টিক সেন্টার ও প্রাইভেট প্র্যাকটিস। জনগণ নিরুপায় না হলে সরকারি হাসপাতালে যায় না। কিন্তু সরকারের বেসরকারিকরণের নীতিতে পাবলিক প্রতিষ্ঠানগুলোর বিকশিত করার পরিকল্পনা নেই, বরাদ্দ অপ্রতুল ফলে মানুষ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে যেতে বাধ্য হয়। এই নীতির কারণে জনস্বাস্থ্যের বিষয়টি পুরোই অবহেলিত। করোনাকালে এটি নগ্নভাবে সামনে এসেছে।

করোনার দ্বিতীয় ঢেউ মোকাবেলায় জনস্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে স্বাস্থ্য খাতে সরকারের বরাদ্দ বাড়ানো প্রয়োজন। সরকারি হাসপাতালে কো?ভিড ওয়া?র্ডে বেড ও আইসিইউ বেডের এর সংখ্যা ও জনবল বৃদ্ধি এবং হাসপাতালের ইমার্জেন্সিতে পর্যাপ্ত অক্সিজেন সিলিন্ডার,ট্রলি, হুইল চেয়ার সরবরাহ নিশ্চিত করার দাবি করছি। অবিলম্বে সরকারের এ বিষয়ে পদক্ষেপ নিতে হবে।"

নরেন্দ্র মোদীর সফরের প্রতিবাদে

সাংবাদিকদের বললেন,"এই যোগাযোগটা দাঁড়ালে আমাদের রপ্তানী ক্ষমতা বাড়বে। সময় ও অর্থ বাঁচবে।"

এই আমাদের মানে কাদের তা সাধারণ মানুষকে বুঝতে দেয়া হয় না। রপ্তানী করেন দেশের হাজার হাজার কোটি টাকার মালিক শিল্পপতিরা। এই পুঁজির মালিকদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের পণ্য নেপালে ও ভুটানে রপ্তানী করার জন্য অর্থাৎ নেপাল ও ভুটানের বাজার ধরার জন্য বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী সওয়াল করছেন। তাদের 'সময় ও অর্থ' বাঁচবে বলে তৃপ্তিতে বাক্য উদগিরন করছেন দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী।

অথচ দেশের উত্তরাঞ্চলের কৃষকদের জন্য এক অভিশাপ হয়ে আছে তিস্তা নদী। তিস্তার পানির ন্যায্য হিস্যা আমরা এখনও পাইনি। গ্রীষ্মের মরু আর বর্ষার বন্যায় সব হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে প্রতিবছর সর্বহারা হয় লাখো মানুষ, শ্রম ছাড়া যাদের আর কোন সম্বল নেই। শুধু তিস্তা নয়, ফারাক্কা ও টিপাইমুখে ভারতের বাঁধ নির্মাণ নিয়ে আন্দোলন হয়েছে, কিন্তু কোন ফল আসেনি। অভিন্ন নদীর পানির ন্যায্য হিস্যার দাবিই ঠিকমতো ভারতের কাছে করা হল না। এই কৃষকদের 'সময় ও অর্থ' সরকারের কাছে মূল্যহীন, মূল্যবান পুঁজিপতিদেরটা। তাই চিলাহাটি দিয়ে রাস্তা কী করে হবে তাই নিয়ে সওয়াল হয়, চিলাহাটির পাশে হাজার হাজার কৃষক যে চোখের জলে জমিন ভিজিয়ে দিচ্ছে সে নিয়ে সওয়াল হয় না। করিডোর-ট্রানজিট, শুল্ক, কর ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা হয়, দেশের জল-জমি নিয়ে আলোচনা হয় না।

আলোচনা হল না সীমান্ত হত্যা নিয়ে, যা আজ এক অসহনীয় অবস্থায় গিয়ে পৌঁছেছে। সীমান্তবর্তী মানুষের জীবন-জীবিকার প্রয়োজনেই সীমান্তের কাছাকাছি যেতে হয়। মাছ ধরার জন্য জেলে, চাষবাস করার জন্য কৃষক, কেনাবেচার জন্য সীমান্ত এলাকার ছোটখাট ব্যবসায়ীদের বিভিন্ন কারণে সীমান্ত যেতে হয়। অথচ 'গরু চোরাচালানকারী' আখ্যা দিয়ে এসকল সাধারণ মানুষকে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী নির্বিচারে গুলি চালায়, নির্যাতন করে। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থাগুলোর প্রতিবেদনে এই বিষয়টি খুবই গুরুত্বের সাথে এসেছে। গত দশ বছরে ভারতীয় বাহিনীর হাতে ৯৩৩ জন বাংলাদেশী নিহত হয়েছে। মাছ ধরতে গিয়ে, চাষ করতে গিয়ে গ্রেফতার হয়ে ভারতের জেলে বছরের পর বছর ধরে আছেন কতজন তার সংখ্যাও আমাদের দেশের সরকার জানেন না। এইসকল হত্যার কোন বিচার ভারতের আদালতে হয় না। বহুল আলোচিত ফেলানী হত্যার বিচার ৯ বছর ধরে আজও চলমান।

সীমান্তে ফ্ল্যাগ বৈঠক করে এর সমাধান সম্ভব নয়। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর কাছে বাংলাদেশের এ বিষয়ে ব্যাখ্যা দাবি করা দরকার ছিল, দরকার ছিল সীমান্তে চলাচল সম্পর্কিত নিয়মনীতি প্রতিষ্ঠিত করার। কিন্তু এ বিষয় নিয়ে আলোচনা হল না। কারণ সীমান্তবর্তী মানুষের জীবনের মূল্য সরকারের কাছে খুব বেশি নয়। পুঁজিপতিদের 'সময় ও অর্থের' নিশ্চয়তা বিধান করার দায় নিয়েই তারা চিন্তিত।

অথচ ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী কূটনৈতিক শিষ্টাচার ভঙ্গ করে দ্বিপাক্ষিক বিষয় ছাড়াও তার দেশের নির্বাচনে নিজ দলের রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের কাজটি এ সফরের মাধ্যমে খুব সূচারুরূপে করেছেন। গোপালগঞ্জের ওড়াকান্দিতে মতুয়া সম্প্রদায়ের মন্দিরে যাওয়া বাস্তবে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে দলকে জেতানোর প্রচেষ্টামাত্র। পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনের মোট ২৯৪টি বিধানসভার ১৪টি বিধানসভার ফল পুরোপুরি নির্ভর করে মতুয়া ভোটের ওপর। আর মোট ৬০ থেকে ৭০টি বিধানসভায় ৫ থেকে ১০ হাজার করে মতুয়া ভোটার রয়েছে। এ কথাগুলো আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে এসেছে। ভারতের সরকারের পক্ষ থেকে কোন প্রতিবাদ জানানো হয়নি।

ফলে অবধারিতভাবে দেশের জনগণের স্বার্থ সম্পর্কিত আলোচনা না করা, যতটুকু আলোচনা সেটা মূলত দেশীয় পুঁজিপতিশ্রেণির বাজার বিস্তৃতির জন্য তাদের হয়ে দরকষাকষি এবং লোকদেখানো আইসিটি, খেলার সরঞ্জাম কেনা ইত্যাদি চুক্তি – এই হলো দিনশেষে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সাথে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ও সরকারের পক্ষ থেকে আলোচনার সারাংশ। এই সফরের অন্যান্য দিক বাদ দিয়ে মোটাদাগে দুটি রাষ্ট্রের প্রধান নির্বাহীর সাক্ষাৎ বিবেচনা করলেও, এ থেকে বাংলাদেশের জনগণের বিন্দুমাত্র উপকার ঘটেনি। অথচ এই প্রবল অতিথির আতিথেয়তার খরচ মেটানোর রাষ্ট্রীয় অর্থ এই জনগণের পকেট থেকেই গেছে।

তবে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, নরেন্দ্র মোদি আসার সময় বাংলাদেশের জনগণের জন্য ১২ লক্ষ ডোজ কোভিড টিকা ও ১০৯ টি অ্যাম্বুলেন্স এনেছেন।

নরেন্দ্র মোদির আগমনের বিরুদ্ধে সংঘটিত প্রতিবাদ বিক্ষোভে ছাত্রলীগ-যুবলীগ-পুলিশের হামলা দেশের কোন গণতান্ত্রিক চিন্তাসম্পন্ন লোকই সমর্থন করেন না। সরকার কোন ধরনের প্রতিবাদের উপরই জুলুম করার অধিকার রাখে না। তাই মোদিবিরোধী বিক্ষোভে বামপন্থী ছাত্রসংগঠনের উপর, সাধারণ ছাত্র ও যুব অধিকার সংরক্ষণ পরিষদের উপর এবং হেফাজতে ইসলামের উপর যে হামলা ও আক্রমণ চলেছে তার বিরুদ্ধে সকল গণতন্ত্রমনা মানুষই প্রতিবাদ করেছেন। একটি আন্দোলনে যখন বিভিন্ন শক্তি একই লক্ষ্যে যুক্ত হয় তখন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হল কারা, কী কী প্রশ্নে এই আন্দোলনে পৃথক পৃথকভাবে হলেও সমবেত হয়েছে? আন্দোলনে যুক্ত সকল শক্তিরও তাদের নিজ নিজ বক্তব্য মানুষের কাছে পরিষ্কার করা দরকার। তখন জনগণও এ থেকে শিক্ষিত হয় এবং এর মাধ্যমে প্রকৃত আন্দোলনের শক্তি জনগণের মধ্যে তাদের যুক্তিসংগত অবস্থান তৈরি করতে পারে।

এক্ষেত্রে প্রথমেই আলোচনা করা দরকার বামপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলো নরেন্দ্র মোদির আগমনের বিরোধীতা করেছে কেন?

প্রথমত, মোদি সাম্প্রদায়িক। তিনি গুজরাটের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পরিকল্পনাকারী ও রূপকার। ২০০৪ সালে সংগঠিত এই দাঙ্গার পর মোদি শুধু ভারতে নয়, গোটা বিশ্বেই ঘৃণিত ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছিলেন। আমেরিকা তাদের দেশে মোদির প্রবেশ নিষিদ্ধ করেছিলো। মোদির দল বিজেপি ভারতে বিভাজনের রাজনীতির চর্চা করে গোটা ভারতের সমাজকে কলুষিত করেছে। উগ্র মুসলিমবিরোধীতা সৃষ্টি করেছে। খোদ ভারতেরই বিভিন্ন প্রদেশে মোদির আগমনকে কেন্দ্র করে বিক্ষোভ ও কুশ পুত্তলিকা পোড়ানোর ভুরিভুরি নজির আছে। ফলে মোদির আগমনের বিরোধীতা যে কোন গণতান্ত্রিক শক্তির পক্ষে স্বাভাবিক।

দ্বিতীয়ত, মোদি সাম্রাজ্যবাদী ভারতের প্রতিনিধি। বাংলাদেশের জন্মলগ্ন থেকেই ভারত তার উপর সাম্রাজ্যবাদী শোষণ চালিয়ে আসছে। মনে রাখা দরকার বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের জনগণের সমর্থন আর ভারতীয় শাসকশ্রেণির সমর্থনের পেছনে উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন। ভারতের জনগণ মানবিক অবস্থান থেকে বাংলাদেশের মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে। একটা প্রতিবেশী দেশের মানুষের উপর নির্মম গণহত্যা চালিয়ে তাদের জাতি গঠনের সংগ্রামকে স্তব্ধ দেয়ার মতো ভয়ংকর ঘটনাকে তারা মেনে নিতে পারেনি। আর ভারতের সরকার, যে ছিল ভারতীয় পুঁজিপতিশ্রেণির প্রতিনিধি, সে বাংলাদেশকে দেখেছিল তার নতুন বাজার হিসেবে। ফলে এই দেশ তার জন্মলগ্ন থেকেই ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও আগ্রাসনের শিকার। এর বিরুদ্ধে এ দেশের জনগণের দীর্ঘ লড়াই-সংগ্রামের ইতিহাস আছে। মোদি সেই ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদের প্রতিনিধি। বামপন্থীরা সাম্রাজ্যবাদবিরোধী, গণতন্ত্রমনস্ক হিসেবে মোদির আগমনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবে এটাই স্বাভাবিক।

তৃতীয়ত, মোদি একজন ফ্যাসিস্ট শাসক। তিনি তার দেশের একচেটিয়া পুঁজির সমর্থন নিয়ে ক্ষমতায় এসেছেন। মোদির নির্বাচনী প্রচার তহবিল যেভাবে বড় বড় কর্পোরেট সংস্থাগুলো ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তুলেছে এবং প্রায় সবগুলো মিডিয়া যেভাবে মোদিকে প্রচার করেছে তা আমরা জানি। এরপর তিনি এক জাতি, এক ভাষার স্লোগান তুলেছেন এবং হিন্দু ধর্মকে ভিত্তি করে একটা সাংস্কৃতিক রেজিমেন্টেশন গড়ে তোলার চেষ্টা করছেন। বিরোধী সকল মত-পথ তার সরকার দমন করছে, ভারতবর্ষের বিভিন্ন জাতি-ভাষা-ধর্ম-সংস্কৃতির যে বৈচিত্র্যময়তা তাকে অস্বীকার করছে এবং ভারতবর্ষের একচেটিয়া পুঁজিপতি তথা ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থরক্ষার জন্য দেশের মধ্যে চূড়ান্ত ফ্যাসিবাদী দমন-নিপীড়ণ চালিয়ে যাচ্ছে। এর বিরুদ্ধে ভারতের গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন মানুষেরা লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। মত প্রকাশের স্বাধীনতাসহ একচেটিয়া পুঁজিপতিদের স্বার্থে গোটা রাষ্ট্রকে নগ্নভাবে ব্যবহারের বিরুদ্ধে আমাদের দেশের বামপন্থীরা লড়ছে। তারা লড়ছে ফ্যাসিবাদী সরকারের দমন-নিপীড়ণ-গুম-খুনসহ রাষ্ট্রের সমস্ত সংস্থাকে প্রধান নির্বাহীর কর্তৃতাধীনে নিয়ে আসার বিরুদ্ধে। ফলে ফ্যাসিবাদবিরোধী অবস্থান থেকেও বামপন্থীরা মোদির আগমনের বিরোধীতা করেছে।

মোদির আগমনের বিরোধীতা হেফাজতে ইসলামও করেছে। হেফাজতের মোদিবিরোধীতার জায়গাটা প্রধানত মোদির সাম্প্রদায়িক অবস্থানকে কেন্দ্র করে। একইসাথে হেফাজত প্রচণ্ডমাত্রায় ভারতবিরোধী, তাদের বক্তব্যে সেটা প্রায়ই লক্ষ্য করা যায়।

প্রতিটি রাজনৈতিক আন্দোলনের সাথে তার দর্শনগত প্রশ্ন জড়িত। হেফাজতের মোদি বিরোধীতার দার্শনিক ভিত্তি কী? তাদের ভারতবিরোধীতা কি ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদবিরোধীতা? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর জরুরী।

প্রথমত, হেফাজত মোদির 'হিন্দু জাত্যাভিমান'এর মতই এদেশে 'মুসলিম জাত্যাভিমানে' বিশ্বাসী। মোদির মতো তারাও এদেশে সকল রকম বৈচিত্র্যকে অস্বীকার করেন। প্রকাশ্যে অবিশ্বাসীদের খতম করার হুকুম জারি করা কিংবা সামান্য উস্কানি ও গুজবে অন্য ধর্মের লোকেদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়া শুধু নয়, ইসলাম ধর্মের মধ্যেও শিয়া, আহমদিয়া কিংবা অন্য মজহাবের লোকেদের উপরও তারা খড়গহস্ত। মুদি হিন্দু সাম্প্রদায়িক শক্তি হলে তারাও একই ধরনের বৈশিষ্ট্য নিয়ে একটি মুসলিম সাম্প্রদায়িক শক্তি।

দ্বিতীয়ত, হেফাজতের ভারতবিরোধীতা বাস্তবে এদেশে একটা সাম্প্রদায়িক জমি তৈরির জন্য, ভারতীয় শাসকগোষ্ঠীকে তারা কখনও বিশ্লেষণ করেননি। তারা ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ভিত্তি নিরূপণ করেননি। ভারতের সাম্রাজ্যবাদী শোষণের ফলে এদেশের মানুষের মধ্যে যে বিক্ষুব্ধতা সৃষ্টি হয়, ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ হিন্দু ধর্ম অনুসরন করার কারণে, একে কেন্দ্র করে এই দেশে মুসলিম সাম্প্রদায়িক মনন ও ধর্মীয় জঙ্গীত্ব প্রচারে সুবিধা হয়। এটাই তারা করে থাকেন। ফলে তাদের ভারতবিরোধীতা মানে সাম্রাজ্যবাদবিরোধীতা নয়।

তৃতীয়ত, হেফাজত কোন ফ্যাসিবাদবিরোধী শক্তি নয়। তারা দর্শনগতভাবে ভিন্ন মত সহ্য করেন না, এটা আমরা আগেই বলেছি। জাতির জনক কিংবা প্রধানমন্ত্রীর নামে কোন সমালোচনা করলে সরকারের পক্ষ থেকে যেমন সংশ্লিষ্ট লোকের উপর আক্রমণ নেমে আসে, তেমনি হেফাজতের কোন নেতার ব্যাপারে কোন মন্তব্য করলে তার অনুসারীরা এটাকে গণতান্ত্রিক মানসিকতা থেকে নেন না। এর নজির খোঁজার জন্য বেশিদূর যাওয়ার দরকার নেই। সুনামগঞ্জের শাল্লার ঘটনায় আওয়ামী লীগ যুক্ত থাকলেও মামুনুল হকের ভক্তদের যে একাজে সহজেই ব্যবহার করা গিয়েছিল এটা হেফাজত নেতাকর্মীদের অনেকে ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়ে স্বীকারও করেছেন। মামুনুল হক পরবর্তীতে এই ঘটনার নিন্দা জানিয়েছেন। কিন্তু তার সমালোচনা করা যে কোন গর্হিত কাজ নয় কিংবা তাকে নিয়ে কেউ কটুক্তি করলেও সেই লোকের যে ক্ষতি করা চলে না- এই ধরনের কোন বক্তব্যই তার কিংবা হেফাজত নেতাদের দিক থেকে আসেনি। হেফাজত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টপাধ্যায়কে সাহিত্যিক হিসেবে দেখে না, দেখে হিন্দু হিসেবে। এবং তারা একারণে এই দু'জনসহ আরও অনেক সাহিত্যিকের লেখা পাঠ্যপুস্তক থেকে বাদ দেয়ার দাবি করেছে। হিটলারও আইনস্টাইনকে বিজ্ঞানী হিসেবে দেখতেন না, দেখতেন ইহুদি হিসেবে। সেকারণে আইনস্টাইনের স্থান জার্মানীতে হয়নি। ভারতেও বিজেপিকে আমরা একই কাজ করতে দেখছি। ফলে রাজনৈতিক ও দার্শনিক দিক থেকে হেফাজত কোন ফ্যাসিবাদবিরোধী শক্তি নয়।

এমনকি হেফাজত আওয়ামী লীগের অপশাসনের বিরোধীও নয়। ১৭ জন নিহত হওয়ার পরও হেফাজতের মহাসচিব জুনায়েদ বাবুনগরী বলেছেন, তাদের সরকারের সাথে কোন সংঘাত নেই। নাস্তিকরা তাদের সাথে সরকারের দূরত্ব সৃষ্টি করেছে। এর আগেও তারা কওমী মাদ্রাসার স্বীকৃতি প্রদনের জন্য কৃতজ্ঞতাস্বরূপ শেখ হাসিনাকে 'কওমী জননী' আখ্যা দিয়েছেন। এগুলো নতুন নয়। শাপলা চত্বরের ঘটনার পর সরকারের সাথে হেফাজতের বিরাট অংকের টাকার লেনদেনের কথা সকলেরই জানা।

তাদের এই হাক ডাক বাস্তবে একটা ক্ষমতার লড়াই। নিরীহ মাদ্রাসা ছাত্ররা এর নির্মম বলি হয়।

অপরদিকে আওয়ামী লীগ অসাম্প্রদায়িক শক্তি নয়। ধর্ম ফ্যাসিবাদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। ধর্মের উদার দিক নয়, সমাজের প্রতি তার দায়িত্বের দিক নয় - ধর্মীয় কুসংস্কারের চর্চা সমাজমননে যে কূপমন্ডুকতা, উগ্রতা সৃষ্টি করে সেটাই ফ্যাসিবাদের টিকে থাকার জমিন। আওয়ামী লীগ সেটাই করছে। সেজন্য তার হেফাজতের অন্যায় দাবি মেনে নিতে কোন আপত্তি নেই।

ফ্যাসিবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী লড়াই একই সূত্রে গাঁথা। সঠিক রাজনৈতিক- দার্শনিক বোঝাপড়া ছাড়া এই লড়াই সম্ভব নয়। বিশাল সংখ্যক লোক পেছনে থাকলেই ফ্যাসিবাদকে উপরে ফেলা যায় না, যতক্ষণ না এর বিরুদ্ধে যুক্তিগুলো পরিস্কার হয়। তা না হলে সকল রক্তদানই ব্যর্থ হবে, প্রকারান্তারে ফ্যাসিবাদকেই শক্তিশালী করবে।

রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় ধর্মীয়

সরকার উগ্র হিন্দুত্ববাদী ও ফ্যাসিস্ট বিজেপি নেতা ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। এইভাবে গত ৫০ বছর ধরে গণবিরোধী ও লুটপাটের পুঁজিবাদী শাসন টিকিয়ে রাখার প্রয়োজনে শোষিত জনসাধারণকে বিভক্ত করে রাখতে আওয়ামী লীগ-বিএনপি-জাতীয় পার্টি ইত্যাদি ধনিকশ্রেণীর দলগুলো নিজেরা ধর্মকে রাজনীতিতে ব্যবহার করেছে এবং মৌলবাদী গোষ্ঠীর সাথে আপোষ ও পৃষ্ঠপোষকতা করেছে। এর ফলাফলে ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের দুর্বলতার সুযোগে শক্তিশালী হয়েছে জামায়াতে ইসলাম-হেফাজতে ইসলামসহ সাম্প্রদায়িক উগ্রবাদী অপশক্তি, যারা ১৯৭১ সালে পরাজিত ও গণবিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল।"

কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী দাবি জানান, "শাল্লার ঘটনায় যথাযথ তদন্ত করে নেপথ্য হোতা, মদদদাতা ও অংশগ্রহণকারীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিতে হবে। ক্ষতিগ্রস্তদের সহানুভূতি ও সম্মানের সাথে ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন করতে হবে এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। একইসাথে ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা ও উগ্রবাদের বিরুদ্ধে জনগণকে সচেতন ও শিক্ষিত করতে হবে। মৌলবাদী গোষ্ঠী ও ধর্মের নামে হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টিকারীদের অপপ্রচারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। পাশাপাশি জনজীবনের সংকট নিরসন ও অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে ধর্ম-জাতি নির্বিশেষে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ধারাকে শক্তিশালী করতে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে।"

সরকারের লকডাউনের ঘোষণা

'ইউকে ভ্যারিয়েন্ট' পাওয়া যাওয়ার পর, সংক্রমণ দ্রুত বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। কিন্তু গত দুইমাস যুক্তরাজ্য থেকে যাত্রী আসার বিষয়ে সরকার কড়াকড়ি আরোপ করেনি। ফেব্রুয়ারি থেকেই সংক্রমণ বাড়তে থাকার প্রবণতা দেখা গেলেও, সরকার নিয়ন্ত্রণমূলক কোন পদক্ষেপ নেয়নি। ফলে করোনার দ্বিতীয় ঢেউ শুরু হওয়ার পর দেখা গেল, সরকারের স্বাস্থ্য অধিদপ্তর সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত ও পরিকল্পনাহীন। তড়িঘড়ি করে সর্বশেষ ২৮ মার্চ সরকার ১৮ দফা নির্দেশনা জারি করে, তাও অস্পষ্টতা ও স্ববিরোধিতায় পূর্ণ। নির্দেশনায় একদিকে জনসমাবেশ নিরুৎসাহিত করার কথা বলা হয়েছে, অন্যদিকে তার কয়েকদিনের মধ্যেই লক্ষ মানুষের সমাবেশ ঘটিয়ে সরকারি উদ্যোগে মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা নেওয়া হলো। সে ১৮ দফা নির্দেশনা কিছুটা কার্যকর করার আগেই আবার লকডাউন ঘোষণা করা হলো। স্বাভাবিক ভাবেই জনগণ প্রত্যাশা করেছিলো, গতবছরের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে করোনার দ্বিতীয় ঢেউ মোকাবেলা করার জন্য সরকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে। সকল জনগোষ্ঠীকে সচেতন করা ও করোনা পরীক্ষার আওতায় নিয়ে আসতে সকল উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রয়োজনে বাড়ি বাড়ি গিয়ে করোনা পরীক্ষার আয়োজন করা, সকল জেলা হাসপাতালে পর্যাপ্ত বেড, আইসিইউ, সেন্ট্রাল অক্সিজেন ব্যবস্থা তৈরি করাসহ আনুষঙ্গিক আয়োজন করা। কিন্তু প্রস্তুতির জন্য একবছর সময় পেলেও, সরকার সে প্রস্তুতি নেয়নি। অনেক জেলাতেই করোনা পরীক্ষার কোন আয়োজন নেই, সব জেলা হাসপাতালে আইসিইউ, সেন্ট্রাল অক্সিজেন প্লান্ট নেই। পত্রিকার রিপোর্ট অনুযায়ী, করোনা সংক্রমণের উচ্চ ঝুঁকিতে থাকা ৩১ জেলার মধ্যে ১৫ টিতেই আইসিইউ নেই। অথচ গত জুনে প্রধানমন্ত্রী প্রতিটি জেলা সদরে জরুরী ভিত্তিতে আইসিইউ স্থাপনের ঘোষণা দিয়েছিলেন। করোনা সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণের জন্য সময়োপযোগী যেসব পদক্ষেপ দরকার ছিল, তা না নিয়ে সংক্রমণ বৃদ্ধির জন্য জনগণের উদাসীনতার উপর পুরো দায় চাপিয়ে, সরকার তার ব্যর্থতা আড়াল করতে চায়।

লকডাউন চলাকালীন ওয়ার্ডভিত্তিক বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা, প্রশাসনকে কাজে লাগিয়ে প্রতিটি শ্রমজীবি পরিবারে দুই সপ্তাহ চলার মতো খাদ্যসামগ্রী ও নগদ অর্থ পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা, করোনা রোগীদের চিকিৎসা রাষ্ট্রীয় খরচে নির্বাহ করা ও প্রতিটি জেলা উপজেলা পর্যায়ের হাসপাতালে পর্যাপ্ত সিট, আইসিইউ, সেন্ট্রাল অক্সিজেন ব্যবস্থা, পর্যাপ্ত চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মী জরুরী ভিত্তিতে নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন কার স্বার্থে?

স্বাধীনতার পর গত ৫০ বছরের মধ্যে এই সময়টা বাংলাদেশ এক কঠিন দুঃসময় অতিক্রম করছে। অনেক আশা আকাঙ্ক্ষা প্রত্যাশা নিয়ে আমাদের পূর্বপুরুষরা এই ভূখণ্ডটি স্বাধীন করেছিল। স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে এসে পূর্বপুরুষদের সে আশা-আকাঙ্ক্ষা ভুলুণ্ঠিত হতে হতে আজ সে প্রত্যাশা মুখ থুবড়ে পড়েছে। একজন মুক্তিযোদ্ধা যিনি আজও তার মাথা বিক্রি করেননি, তিনি ভাবেন এই বাংলাদেশেই কি আমরা চেয়েছিলাম! যেখানে মত প্রকাশ করার অপরাধে বিনাবিচারে ও মানসিক টর্চার করে ছয়বার জামিনের জন্য আবেদন করেও জামিন না পেয়ে মুশতাকের মত মানুষদের মরতে হয়। কার্টুন আঁকার অপরাধে একজন কার্টুনিস্ট কে জেলে যেতে হয়। অথচ এ ভূখন্ডে একসময় ইয়াহিয়ার ব্যঙ্গ কার্টুন এঁকে তার নিচে 'এই জানোয়ারদের হত্যা করতে হবে' এই লেখা যুক্ত কার্টুন আমরা এঁকেছি। প্রত্যেক চিন্তাশীল মানুষ তাদের চিন্তার সাথে এই বাংলাদেশকে মেলাতে পারে না। আবার শ্রমিক-কৃষক, হকার, মিস্ত্রি, রিকশাচালক, ভ্যানচালক তারা তাদের জীবন দিয়ে বুঝে এই বাংলাদেশের জন্য তারা এবং তাদের পূর্বপুরুষরা জীবন দেয়নি। এই দেশে পেটেভাতে যারা জীবন নির্বাহ করে তারা যেমন সুখে নেই অনুরূপ সুখে নেই সৃজনশীল লেখক সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবীরা, চিন্তাশীল মানুষ। কারণ স্বাধীন দেশে তাদের যেটা সাংবিধানিক অধিকার– মত প্রকাশ করা, স্বাধীনভাবে চিন্তা করা, বিভিন্ন প্লাটফর্মে তাদের সেই স্বাধীন চিন্তার প্রকাশ ঘটানো–এইসব অধিকার কেড়ে নিয়েছে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮। আওয়ামী লীগ সরকার ২০১৮ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর 'অগণতান্ত্রিক' জাতীয় সংসদে এই আইনটা পাস করে তাদের ক্ষমতাকে নিরঙ্কুশ করার জন্য।

আইনে কি বলা আছে

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে ৬২ ধারা ৯ টি অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। ডিজিটাল মাধ্যমের জন্য সর্বপ্রথম আইনটি করা হয় বিএনপি সরকারের সময় ২০০৬ সালে? এরপর ২০১৩ সালে আওয়ামী লীগ সরকার বিতর্কিত ৫৭ ধারা যুক্ত করে ও শাস্তি বাড়িয়ে আইনটিকে আরো কঠোর করে। ২০১৮ সালে আরেকদফা এই আইনটিকে কঠোর করার 'প্রয়োজন' হয়। আওয়ামী লীগের এই 'প্রয়োজনীয়তা' কি তা আমরা পরের দিকে জানবো এখানে আমরা ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের বিভিন্ন ধারার মাধ্যমে কিভাবে আওয়ামী লীগ সরকার বিরোধী মতকে দমন করবে সে সম্পর্কে আলোচনা করব।

ধারা ৮

কতিপয় তথ্য-উপাত্ত অপসারণ বা ব্লক করিবার ক্ষমতা

৮। (১) মহাপরিচালকের নিজ অধিক্ষেত্রভুক্ত কোনো বিষয়ে ডিজিটাল মাধ্যমে প্রকাশিত বা প্রচারিত কোনো তথ্য-উপাত্ত ডিজিটাল নিরাপত্তার ক্ষেত্রে হুমকি সৃষ্টি করিলে তিনি উক্ত তথ্য-উপাত্ত অপসারণ বা, ক্ষেত্রমত, ব্লক করিবার জন্য বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনকে, অতঃপর বিটিআরসি বলিয়া উল্লিখিত, অনুরোধ করিতে পারিবেন।

(২) যদি আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারি বাহিনীর নিকট প্রতীয়মান হয় যে, ডিজিটাল মাধ্যমে প্রকাশিত বা প্রচারিত কোনো তথ্য-উপাত্ত দেশের বা উহার কোনো অংশের সংহতি, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, নিরাপত্তা, প্রতিরক্ষা, ধর্মীয় মূল্যবোধ বা জনশৃঙ্খলা ক্ষুণ্ন করে, বা জাতিগত বিদ্বেষ ও ঘৃণার সঞ্চার করে, তাহা হইলে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারি বাহিনী উক্ত তথ্য-উপাত্ত অপসারণ বা ব্লক করিবার জন্য, মহাপরিচালকের মাধ্যমে, বিটিআরসিকে অনুরোধ করিতে পারিবে।

এই ধারা সংবাদমাধ্যমের ওপর প্রত্যক্ষ আঘাত। এখানে মহাপরিচালক এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর মারফত বিটিআরসি যেকোনো সময় উক্ত অভিযোগে সংবাদ মাধ্যমে যে কোনো প্রতিবেদন ব্লক করতে পারবে। যেসব অভিযোগে ব্লক করতে পারবে সে অভিযোগগুলো খুবই বিমূর্ত। এর 'অর্থ' অনেক রকম করা যায়। যেমন পদ্মাসেতুর দুর্নীতির খবর প্রচারের জন্য বিশ্বব্যাংক এখাতে অথ্যায়ন বন্ধ করে দেয়। এখন দুর্নীতির খবর প্রচার করেছিল যে সংবাদমাধ্যম তার বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে বাধার অভিযোগ করে উক্ত নিউজ টিভি ব্লক করতে পারবে, শাস্তি দিতে পারবে। এতে করে দুর্নীতির খবর প্রচার করা যাবেনা –এরকম একটা সেল্ফ সেন্সর-শিপ সংবাদ-মাধ্যমে কাজ করবে। যেটা স্বাধীন সাংবাদিকতার জন্য সবথেকে বড় প্রতিবন্ধকতা।

ধারা ২১

মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, জাতির পিতা, জাতীয় সংগীত বা জাতীয় পতাকার বিরুদ্ধে কোনো প্রকার প্রপাগান্ডা বা প্রচারণার দণ্ড

২১। (১) যদি কোনো ব্যক্তি ডিজিটাল মাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, জাতির পিতা, জাতীয় সংগীত বা জাতীয় পতাকার বিরুদ্ধে কোনো প্রকার প্রপাগান্ডা ও প্রচারণা চালান বা উহাতে মদদ প্রদান করেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তির অনুরূপ কার্য হইবে একটি অপরাধ।

এই ধারায় সর্বোচ্চ শাস্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা কি? কোনো গবেষক যদি মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে গবেষণা করতে চায় তাহলে সেই সময়ে রাজনৈতিক দলগুলোর ভূমিকার কথা বা স্বাভাবিকভাবে আওয়ামী লীগের ভূমিকার প্রসঙ্গ আসবে। মুক্তিযুদ্ধে আওয়ামী লীগের ভূমিকা, ব্যক্তির ভূমিকার চুলচেরা বিশ্লেষণ আসবে। এই বিশ্লেষণের কোন অংশটা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিরুদ্ধ সেটা ঠিক করবে কে? এখনকার আওয়ামী লীগ!!! এজন্যই মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আসলে কি এ আইনে তার কোন ব্যাখ্যাই করা হয়নি। ফলে এই আইন মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে মৌলিক গবেষণা নিরুৎসাহিত করবে, মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে আওয়ামী কাঠামোর বাইরে আলোচনার পথ রুদ্ধ করবে।

এখানে 'জাতির পিতা' সম্পর্কে কোনো 'প্রপাগান্ডা' চালানো যাবে না বলা হচ্ছে। শেখ মুজিবকে আওয়ামী লীগ এমন একটা জায়গায় নিয়ে যেতে চায় যেখানে তাঁর কোন সমালোচনা চলবে না। কিন্তু আমরা জানি কোন ব্যক্তি ভুলের উর্ধ্বে নয়, ইতিহাসে ব্যক্তির ভূমিকার মূল্যায়ন ও বিশ্লেষণ যে কোনো গবেষণার একটা মৌলিক বিষয়। মহাত্মা গান্ধী, জিন্নাহ থেকে শুরু করে আব্রাহাম লিংকন, জেফারসন, ম্যান্ডেলাকে নিয়ে মূল্যায়ন-বিশ্লেষণ হয়েছে এবং প্রতিনিয়ত হচ্ছে। এই বিশ্লেষণগুলোতে যেমন তাদের পজেটিভ দিক দেখানো হয়, তেমনি তাদের ত্রুটি-বিচ্যুতির দিকেও দেখানো হয়। দোষে গুণে একজন মানুষকে এভাবে দেখা হয়। কিন্তু ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে এই ধরনের মূল্যায়নকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করার সুযোগ রাখা হয়েছে। সুযোটাকে আওয়ামী লীগ সরকার তাদের মর্জি মত কাজে লাগাতে পারবে। কারণ 'জাতির পিতা'র অবমূল্যায়ন বা 'প্রপাগান্ডা' আসলে কি? কী কী করলে 'জাতির পিতা'র অবমূল্যায়ন করা হয় তা এই আইনে স্পষ্ট করে বলা নেই বরং অপপ্রয়োগের জন্যই এই অস্পষ্টতা রাখা হয়েছে।

ধারা ২৫

আক্রমণাত্মক, মিথ্যা বা ভীতি প্রদর্শক, তথ্য-উপাত্ত প্রেরণ, প্রকাশ, ইত্যাদি

২৫। (১) যদি কোনো ব্যক্তি ওয়েবসাইট বা অন্য কোনো ডিজিটাল মাধ্যমে,-

(ক) ইচ্ছাকৃতভাবে বা জ্ঞাতসারে, এমন কোনো তথ্য-উপাত্ত প্রেরণ করেন, যাহা আক্রমণাত্মক বা ভীতি প্রদর্শক অথবা মিথ্যা বলিয়া জ্ঞাত থাকা সত্ত্বেও, কোনো ব্যক্তিকে বিরক্ত, অপমান, অপদস্থ বা হেয় প্রতিপন্ন করিবার অভিপ্রায়ে কোনো তথ্য-উপাত্ত প্রেরণ, প্রকাশ বা প্রচার করেন, বা

(খ) রাষ্ট্রের ভাবমূর্তি বা সুনাম ক্ষুণ্ন করিবার, বা বিভ্রান্তি ছড়াইবার, বা তদুদ্দেশ্যে, অপপ্রচার বা মিথ্যা বলিয়া জ্ঞাত থাকা সত্ত্বেও, কোনো তথ্য সম্পূর্ণ বা আংশিক বিকৃত আকারে প্রকাশ, বা প্রচার করেন বা করিতে সহায়তা করেন,

তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তির অনুরূপ কার্য হইবে একটি অপরাধ।

বাংলাদেশে যারা দুর্নীতিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত, যারা মুদ্রা পাচার করে, শেয়ারবাজার কেলেঙ্কারির সাথে যুক্ত, ব্যাংক লুটপাট করে তাদের জন্য 'বিরক্তিকর' 'বিব্রতকর' 'অপমানজনক' খবর প্রচারে বাধা আইনের এই ধারা। দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের সুরক্ষা দিতেই আইনের এই ধারা যুক্ত করা হয়েছে। না হলে এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তির দ্বারা বিব্রত হলে প্রচলিত আইনে তার বিচারের ব্যবস্থা আছে।

এই ধারায় রাষ্ট্রের ভাবমূর্তি সুনাম ক্ষুন্ন করলে শাস্তির কথা বলা হয়েছে। মহামান্য রাষ্ট্রের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয় কিসে? সে কি ব্যাংক খাতে দুর্নীতির খবর প্রচার করলে নাকি পুলিশি হেফাজতে মৃত্যু, গুম-খুন ও বিচারবহির্ভূত হত্যার বিচার চাইলে বা ৩০ ডিসেম্বরের দিনের ভোট রাতে করার অপরাধের কথা বললে? যেসব অপরাধের মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগ প্রতি মুহূর্তেই রাষ্ট্রের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করে চলেছে।

ধারা ২৮

ওয়েবসাইট বা কোনো ইলেকট্রনিক বিন্যাসে ধর্মীয় মূল্যবোধ বা অনুভূতিতে আঘাত করে এমন কোনো তথ্য প্রকাশ, সম্প্রচার, ইত্যাদি

২৮। (১) যদি কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী ইচ্ছাকৃতভাবে বা জ্ঞাতসারে ধর্মীয় মূল্যবোধ বা অনুভূতিতে আঘাত করিবার বা উস্কানি প্রদানের অভিপ্রায়ে ওয়েবসাইট বা অন্য কোনো ইলেকট্রনিক বিন্যাসে এমন কিছু প্রকাশ বা প্রচার করেন বা করান, যাহা ধর্মীয় অনুভূতি বা ধর্মীয় মূল্যবোধের উপর আঘাত করে, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তির অনুরূপ কার্য হইবে একটি অপরাধ।

ধর্মীয় অনুভূতি একটা অস্পষ্ট বিষয়। এর বিভিন্ন ধরনের ব্যাখ্যার সুযোগ আছে এমনকি ইসলাম ধর্মের এক ঘরনার সাথে আরেক ধরানার মানুষের চিন্তা/মাজহাবের পার্থক্য আছে। এখন কে কাকে কোন প্রেক্ষিতে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করল সেটা নির্ধারণ করবে কে? যদি ব্যক্তির অনুভূতির উপর ছেড়ে দেয়া হয় তাহলে তো খুব সহজেই এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তির বিরুদ্ধে এই অভিযোগ তুলবে যে, সে আমার ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হেনেছে। ব্যক্তিগত রেষারেষি থাকলে যে কারো বিরুদ্ধে এই ধারা কাজে লাগানো যাবে।

নারীদের বিরুদ্ধে বেআইনি ফতোয়া, মাদ্রাসা শিক্ষক কর্তৃক ছাত্র বলাৎকার এর মত ঘটনার যারা বিরোধীতা করে তাদের বিরুদ্ধে এই আইন খুব কার্যকরী। এসব অভিযোগ যাদের বিরুদ্ধে করা হয় তাদের একটা বড় ফ্যানাটিক গোষ্ঠী আছে। যারা তাদের অন্ধ সমর্থক। এসব অভিযোগের প্রেক্ষিতে এরকম ফ্যানাটিক গোষ্ঠীর ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত লাগবে এটাই স্বাভাবিক। এ আইনের ফলে এরকম ফ্যানাটিক গোষ্ঠীর কাছে একটা অস্ত্র তুলে দেয়া হল, যা ব্লাসফেমি আইন এর সমার্থক।

ধারা ২৯

মানহানিকর তথ্য প্রকাশ, প্রচার, ইত্যাদি

২৯। (১) যদি কোনো ব্যক্তি ওয়েবসাইট বা অন্য কোনো ইলেকট্রনিক বিন্যাসে চবহধষ ঈড়ফব (অপঃ ঢথঠ ড়ভ ১৮৬০) এর ংবপঃরড়হ ৪৯৯ এ বর্ণিত মানহানিকর তথ্য প্রকাশ বা প্রচার করেন, তজ্জন্য তিনি অনধিক ৩ (তিন) বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

এই ধারাটি ছিল হাজার ৮৬০ সালের ব্রিটিশ শাসনামলে ব্রিটিশ শাসকদের রক্ষা করার জন্য এই ধরনের একটি ধারা সে সময়ে যুক্ত করা হয়েছিল। আর আজ স্বাধীন এই ভূখণ্ডে 'ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮' তে ঠিক সে ধারা যুক্ত করা হলো আজকের দিনের শাসকশ্রেণীর মানহানি ঠেকানোর জন্য। এই ধারা তাদের জন্য একটা রক্ষাকবচ।

ধারা ৩২

সরকারি গোপনীয়তা ভঙ্গের অপরাধ ও দণ্ড

৩২। (১) যদি কোনো ব্যক্তি ঙভভরপরধষ ঝবপৎবঃং অপঃ, ১৯২৩ (অপঃ ঘড়. ঢওঢ ড়ভ ১৯২৩ এর আওতাভুক্ত কোনো অপরাধ কম্পিউটার, ডিজিটাল ডিভাইস, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক, ডিজিটাল নেটওয়ার্ক বা অন্য কোনো ডিজিটাল মাধ্যমে সংঘটন করেন বা করিতে সহায়তা করেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক ১৪ (চৌদ্দ) বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনধিক ২৫ (পঁচিশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

একটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের গোপন কোনো বিষয় থাকতে পারে না। সবকিছুই জনগণের দৃষ্টি গোচর করার জন্যই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্ম। এই ধারা নিয়ে সম্পাদক পরিষদ যে বিবৃতি দিয়েছে তা নিম্নরূপঃ

অফিশিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্ট ঔপনিবেশিক আমলের ব্যাপক নিয়ন্ত্রণমূলক আইন, যা ব্রিটিশ প্রশাসনকে সব ধরনের জবাবদিহি থেকে রক্ষা করার জন্য প্রণয়ন করা হয়েছিল। আমরা মর্মাহত হয়ে সেটিকে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে টেনে আনতে দেখলাম। সরকার যা প্রকাশ করে না, তা-ই 'সরকারি গোপন তথ্য' বলে বিবেচিত হতে পারে। একটি উদাহরণ দিই। বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুসন্ধানে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে আমরা ব্যাংক খাতের অনিয়ম সম্পর্কে কয়েক ডজন প্রতিবেদন প্রকাশ করেছি। বলা হতে পারে, এ ধরনের সব প্রতিবেদনই অফিশিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্ট লঙ্ঘন করেছে। প্রকাশ করা হয়নি, এমন সব সরকারি প্রতিবেদনই অফিশিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্টের আওতায় পড়ে, এমনকি পরিবেশদূষণ বা শিশুপুষ্টি নিয়ে সরকারি প্রতিবেদন ইত্যাদিও। এ ধরনের কোনো তথ্য ছাড়া কি অর্থপূর্ণ সাংবাদিকতা সম্ভব? আর যেখানে তথ্য অধিকার আইনের বলে জনগণের 'জানার অধিকার' রয়েছে বিশেষত যখন এ ধরনের সব প্রতিবেদন তৈরি করা হয় জনগণের অর্থ ব্যয় করে সেখানে এসব প্রতিবেদন সাংবাদিকতার কাজে ব্যবহার করা কেন 'অপরাধ' বলে গণ্য হবে? বাংলাদেশ ব্যাংক বা সরকারি দপ্তরের অপ্রকাশিত প্রতিবেদন ছাড়া ফারমার্স বা বেসিক ব্যাংকের খেলাপি ঋণ বা ব্যাপক অনিয়ম নিয়ে কি আমরা কোনো প্রতিবেদন তৈরি করতে পারতাম? আমাদের প্রতিবেদকের হরহামেশাই মোবাইল ফোনে এ ধরনের দলিলের ছবি তুলতে হয়। কাজেই তাদের সর্বোচ্চ যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া যেতে পারে, তাই তো? এ আইনের প্রবক্তাদের কাছে আমাদের উদাহরণগুলো 'হাস্যকর' ঠেকতে পারে। কিন্তু তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের ৫৭ ধারা প্রয়োগের বাস্তব নজির সাংবাদিকদের কোনো স্বস্তির কারণ জোগায়নি।

ধারা ৪৩

পরোয়ানা ব্যতিরেকে তল্লাশি, জব্দ ও গ্রেফতার

৪৩। (১) যদি কোনো পুলিশ অফিসারের এইরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে, কোনো স্থানে এই আইনের অধীন কোনো অপরাধ সংঘটিত হইয়াছে বা হইতেছে বা হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে বা সাক্ষ্য প্রমাণাদি হারানো, নষ্ট হওয়া, মুছিয়া ফেলা, পরিবর্তন বা অন্য কোনো উপায়ে দুষ্প্রাপ্য হইবার বা করিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে, তাহা হইলে তিনি, অনুরূপ বিশ্বাসের কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া, নিম্নবর্ণিত কার্য সম্পাদন করিতে পারিবেন,-

(ক) উক্ত স্থানে প্রবেশ করিয়া তল্লাশি এবং প্রবেশে বাধাপ্রাপ্ত হইলে ফৌজদারি কার্যবিধি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(খ) উক্ত স্থানে তল্লাশিকালে প্রাপ্ত অপরাধ সংঘটনে ব্যবহার্য কম্পিউটার, কম্পিউটার সিস্টেম, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক, তথ্য-উপাত্ত বা অন্যান্য সরঞ্জামাদি এবং অপরাধ প্রমাণে সহায়ক কোনো দলিল জব্দকরণ;

(গ) উক্ত স্থানে উপস্থিত যে কোনো ব্যক্তির দেহ তল্লাশি;

(ঘ) উক্ত স্থানে উপস্থিত কোনো ব্যক্তি এই আইনের অধীন কোনো অপরাধ করিয়াছেন বা করিতেছেন বলিয়া সন্দেহ হইলে উক্ত ব্যক্তিকে গ্রেফতার।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন তল্লাশি সম্পন্ন করিবার পর পুলিশ অফিসার তল্লাশি পরিচালনার রিপোর্ট ট্রাইবুনালের নিকট দাখিল করিবেন।

এই ধারা সবথেকে অগণতান্ত্রিক। পাকিস্তান আমলে গভীর রাতে বাসা বা কোয়ার্টার থেকে শিক্ষক গ্রেফতার খুবই সাধারণ ব্যাপার ছিল। ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমলের আইনগুলো এরকমই ছিল। এত লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে যে দেশ আমরা স্বাধীন করলাম সেই স্বাধীন দেশের পুলিশ দেশের নাগরিককে গ্রেফতার করতে কোনো পরোয়ানা লাগবে না, এ এক নির্মম বাস্তবতা। দেশকে একটা পুলিশি রাষ্ট্রে পরিণত করার যাবতীয় আয়োজন এই ধারার মধ্য দিয়ে করা হয়েছে। এবং গত ১২ বছরে আওয়ামী লীগ শাসনামলে পুলিশের উর্ধ্বতন পদে নিয়োগ দেয়া হয়েছে আওয়ামী লীগের ঘনিষ্ঠজনদের। এজন্য পুলিশের আইজিপি পর্যন্ত আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক নেতার মত বক্তব্য দেয়। বর্তমানে পুলিশ বাহিনীর প্রাতিষ্ঠানিক কোন পেশাদারিত্ব নেই। শুধুমাত্র দলীয় স্বার্থ বাস্তবায়ন করা এই বাহিনীর কাজ। এরকম পুলিশ বাহিনী যখন আইনের ধারা প্রয়োগ করবে তখন মানুষের অবস্থা কী দাঁড়াবে তার সাম্প্রতিক সময়ে হওয়া মামলাগুলোর দিকে তাকালেই দেখা যায়।

কারা এর শিকার এবং বাদী কারা?

প্রথম আলোর রিপোর্ট অনুযায়ী ২০২০ সালে প্রথম ছয় মাসে দায়ের হওয়া ৫০ টি মামলা পর্যালোচনা করে দেখা গেছে 'জাতির পিতা', রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর নামে কটূক্তির অভিযোগে মামলা হয়েছে ৬ টি। এর মধ্যে আছে ময়মনসিংহের ভালুকার তারাগাও উচ্চ বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির শিক্ষার্থী। এই মামলার বাদী ১০ নম্বর হবিরবাড়ী ইউনিয়ন শাখা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক হানিফ মোহাম্মদ নিপুন। গত ৭ জানুয়ারি অর্থনীতি পত্রিকার সম্পাদক আকবর এর বিরুদ্ধে মামলা করেন নোয়াখালী জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সহ-সভাপতি ও তমা গ্রুপের মালিক আতাউর রহমান ভূঁইয়া। প্রতিবেদক আলামিন ও শফিকুল ইসলাম কাজলসহ ৩২ জনের বিরুদ্ধে সাংসদ সাইফুজ্জামান শেখর নিজেই মামলা করেছেন। তাছাড়া যুব মহিলা লীগের দুই নেত্রী আলাদাভাবে মামলা করেছেন তাদের বিরুদ্ধে। কার্টুনিস্ট আহমেদ কবির কিশোরসহ ১১ জনের বিরুদ্ধে মামলা করে র‍্যাব। সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদি কে নিয়ে 'কটূক্তি', আইনমন্ত্রী কে নিয়ে 'কটূক্তি', সাংসদ মমতাজ, ইঞ্জিনিয়ার মোয়াজ্জেম হোসেন রতন এর বিরুদ্ধে অপপ্রচার এর অভিযোগে মামলা হয়েছে। সাবেক সাংসদ মকবুল হোসেন ২৬ বছর ধরে অপরের বাড়ি দখল করে আছেন এমন সংবাদ প্রচারের এর জন্য ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা হয়েছে। লোকসংগীত শিল্পী শরীয়ত বয়াতিসহ বেশ কয়েকজনের বিরুদ্ধে ধর্ম অবমাননার দায়ে মামলা হয়েছে। করোনাকালীন মামলা হয়েছে ত্রাণ বিতরণ ও চিকিৎসার ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তোলা, লকডাউনের মধ্যে একটি প্রতিষ্ঠানের বাস চলা ও কৃষকের মাঠে নেমে কাঁচা ধান কাটার ছবি তোলে শেয়ার করার জন্য। সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিমকে নিয়ে 'কটূক্তি' করার মামলা হয়েছে চারটি। মামলায় গ্রেপ্তার হয়েছেন বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী এবং সাতক্ষীরার এক ব্যক্তি। গত বছরের মে মাসে লেখক মোস্তাক আহমেদ কার্টুনিস্ট কিশোর রাষ্ট্রচিন্তা দিদারুল ইসলাম ও ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের পরিচালক মিনহাজ মান্নানকে গ্রেপ্তার করে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলক কথাবাত্রা ও গুজব ছড়ানোর অভিযোগে এরা সহ মোট ১১ জনের বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা হয়েছে। মামলাগুলো করেছে র‍্যাব। সেই মামলায় মুশতাক কিশোরের জামিন আবেদন ছয় বার নাকচ হয় এবং গত ২৫ ফেব্রুয়ারি কারাগারের অভ্যন্তরে লেখক মুশতাক মারা যায়। সর্বশেষ গ্রেপ্তার হয়েছেন শ্রমিক নেতা রুহুল আমিন। মোদি বিরোধী আন্দোলনের পোস্টার ফেসবুকে শেয়ার করার কারণে খুলনায় তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। গত দুই বছরে এরকম সাংবাদিক, রাজনৈতিক কর্মী, শিল্পী, অভিনেতা,

● ৭ এর পাতায় দেখুন

শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশন সিলেট জেলার সদস্যদের পরিচিতি সভা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশন সিলেট জেলা শাখার উদ্যোগে ১২ মার্চ বিকাল ৩টায় মুসলিম সাহিত্য সংসদে প্রাথমিক সদস্যদের পরিচিতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের সিলেট জেলার আহবায়ক মোখলেসুর রহমানের সভাপতিত্বে ও প্রসেনজিৎ রুদ্রের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি কমরেড জহিরুল ইসলাম, বাসদ(মার্কসবাদী)সিলেট জেলার আহবায়ক কমরেড উজ্জ্বল রায়, সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য শফিকুল ইসলাম, শ্রমিক নেতা জিতু সেন, নির্মাণ শ্রমিক নেতা আব্দুল কাদির, বাংলাদেশ চা শ্রমিক ফেডারেশন নেতা বিরেন সিং,

অজিত রায়, আমেনা বেগম প্রমুখ। সভায় বক্তারা বলেন, শ্রমিকদের অবশ্যই রাজনীতি সচেতন হতে হবে। দৈনন্দিন দাবিদাওয়া, অধিকার আদায় নিয়ে শ্রমিকদের আপসহীনভাবে লড়তে হবে। কিন্তু এর সাথে মূল লড়াই হতে হবে এ শোষণমূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থা উচ্ছেদ করে শোষণহীন শ্রমিকরাজ প্রতিষ্ঠা করা।

তিস্তার পানির ন্যায্য হিস্যা আদায়, ক্ষেতমজুরদের সারা বছরের কাজের দাবিতে রংপুরে ক্ষেতমজুর ও কৃষক সংগঠনের সমাবেশ

তিস্তার পানির ন্যায্য হিস্যা আদায়, চাল-ডাল-তেল ও রান্নার গ্যাসসহ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম কমানো, বন্ধ সকল চিনিকল ও পাটকল অবিলম্বে খুলে আখ ও পাটচাষীদের রক্ষা এবং ক্ষেতমজুরদের সারা বছরের কাজের দাবিতে রংপুরে ২২ মার্চ বাংলাদেশ ক্ষেতমজুর ও কৃষক সংগঠনের উদ্যোগে রংপুর প্রেসক্লাব চত্তরে সকাল ১১টায় মানববন্ধন-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সংগঠনের জেলা আহবায়ক এবং বাসদ (মার্কসবাদী) রংপুর জেলার সমন্বয়ক কমরেড আনোয়ার হোসেন বাবলুর সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের জেলা সাধারণ সম্পাদক আহসানুল আরেফিন তিতু, সদস্য এমদাদুল হক বাবু, বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশন রংপুর জেলার আহবায়ক শাহিদুল ইসলাম সুমন প্রমুখ

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, একদিকে সরকার ঘটা করে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী পালন করছে অন্য দিকে দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতিতে জনগণের নাভিশ্বাস উঠছে। ঠিকভাবে শিক্ষার, চিকিৎসা ব্যয় বহন তো দূরের কথা, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস কিনতেই জনগণকে ঋণগ্রস্ত হতে হচ্ছে। করোনায় লক্ষ লক্ষ মানুষ কাজ

হারিয়েছে। ক্ষেতমজুরদের সারা বছরের কাজ নেই। বাজারে জিনিসের অগ্নিমূল্য হলেও কৃষক তার ফসলের ন্যায্যমূল্য না পেয়ে সর্বশান্ত হচ্ছে। দেশের অভ্যন্তরে খুন, ধর্ষণ, ডিজিটাল আইনের অপব্যবহার করে মত প্রকাশের অধিকার কেড়ে নেয়ার মহোৎসব চলছে। আবার ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য দেশের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিচ্ছে। দেশের স্বার্থে তিস্তার পানির ন্যায্য হিসাব আদায়ে সরকারের কার্যকর কোন পদক্ষেপ নেই। অবিলম্বে দেশের স্বার্থে, জনগণের স্বার্থে তিস্তার পানির ন্যায্য হিস্যা আদায়, বন্ধ সকল চিনিকল পাটকল খুলে দেয়া, চাল-ডাল-তেলসহ নিত্যপ্রয়াজনীয় দ্রব্যের দাম কমানোর এবং ক্ষেতমজুরদের সারা বছরের কাজের নিশ্চয়তা বিধান করতে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সরকারের প্রতি জোর দাবি জানান নেতৃবৃন্দ।

বন্ধ চিনিকল-পাটকল চালুর দাবিতে মিছিল-সমাবেশ অনুষ্ঠিত

গত ১২ মার্চ বিকাল ৪টায় জাতীয় প্রেক্লাবের সামনে বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশন ঢাকা মহানগর শাখার উদ্যোগে চিনিকল-পাটকল আধুনিকায়ন করে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে চালু, শ্রমিকদের বকেয়া বেতন অবিলম্বে পরিশোধ, দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি রোধ, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন বাতিল, শ্রমিকনেতা রুহুল আমিনসহ অন্যায়ভাবে গ্রেপ্তারকৃত সকল নেতৃবৃন্দের নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে মিছিল-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের মহানগর শাখার সভাপতি রাজু আহমেদের সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহসভাপতি মানস নন্দী, মহানগর শাখার সাধারণ সম্পাদক মানিক হোসেন, ভজন বিশ্বাস, শহিদুল ইসলাম, প্রমুখ।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, “সরকার জনগণের কোনো মতের তোয়াক্কা না করেই একের পর এক গায়ের জোরে জনবিরোধী সিদ্ধান্ত নিয়ে চলেছে। ২৫টি রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকল ও ৬টি চিনিকল বন্ধ করার মাধ্যমে দেশের এক বৃহৎ অংশের শ্রমিক, আখচাষি, পাটচাষি ও এসব শিল্পে কয়েক কোটি পরিবারকে অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়েছে। তারা এখন নিদারুণ কষ্টে দিন পার করছে।

অন্যদিকে বেড়ে চলেছে মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় জিসিপত্রের দাম। চাল-ডাল-তেল-লবণ, সবজি, মাছসহ বাজারের সকল জিনিসের দাম এখন সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে। ফলে সবচেয়ে বেশি কষ্টে কাটছে নিম্নবিত্ত-শ্রমজীবী অসহায় মানুষদের জীবন। কিছু দিন পরেই রোজার মাস। অথচ সিন্ডিকেট-ব্যবসায়ীদের স্বার্থে বর্তমান সরকার নিচ্ছে না দাম নিয়ন্ত্রণে কোনো সুষ্ঠু পদক্ষেপ। ফলে পণ্য ও ফসল উৎপাদনকারী শ্রমিক-কৃষক যেমন বেতন বা ফসলের ন্যায্য দাম না পেয়ে ঠকছে; তেমনি ভোক্তা হিসেবে সকল ক্রেতাদেরও সেই ভোগান্তিতে দিন কাটছে।” অবশেষে নেতৃবৃন্দ সরকারের বিরাষ্ট্রীয়করণ বন্ধ, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন বাতিল, দ্রব্যমূল্য রোধ, শ্রমিকনেতা রুহুল আমিনসহ অন্যায়ভাবে গ্রেপ্তারকৃত নেতৃবৃন্দের নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে সকল স্তরের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান।

রংপুরে ছাত্র ফ্রন্টের উদ্যোগে মুক্তিযুদ্ধের ক্যাম্প-২০২১ অনুষ্ঠিত

নতুন প্রজন্মের সামনে মুক্তিযুদ্ধের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস তুলে ধরার লক্ষ্যে ২৮ মার্চ সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধের ক্যাম্প-২০২১ অনুষ্ঠিত হয়। রংপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত এই ক্যাম্পে চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা, রণাঙ্গন থেকে চিঠি লেখা, মুক্তিযুদ্ধের আলোকচিত্র প্রদর্শনী, সিনেমা প্রদর্শন, আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন ঘোষণা করেন রংপুরের কিশোর শহীদ শংকু সমাজদারের মা দিপালী সমাজদার। সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট রংপুর মহানগর কমিটির আহ্বায়ক সাজু বাসফোরের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন বীর মুক্তিযোদ্ধা সদরুল আলম দুলু, বাসদ(মার্কসবাদী) রংপুর জেলার সমন্বয়ক কমরেড আনোয়ার হোসেন বাবলু, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড.তুহিন ওয়াদুদ, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি মাসুদ রানা, বাসদ(মার্কসবাদী) রংপুর জেলার সদস্য আহসানুল আরেফিন তিতু, বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্র কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কামরুন্নাহার খানম শিখা।

ময়মনসিংহে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক ক্যাম্প ‘গেরিলা ২১’ অনুষ্ঠিত

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট ময়মনসিংহ জেলা শাখার উদ্যোগে মুক্তিযুদ্ধের সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে ছাত্র যুবকদের অংশগ্রহণে দিনব্যাপী মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক ক্যাম্প ‘গেরিলা ২১’ আয়োজিত হল। ২৭ মার্চ নগরীর মুসলিম ইন্সটিটিউটে এ ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। শতাধিক ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণে এ ক্যাম্প আয়োজনে ছিল মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস এবং বর্তমান দেশের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা, সিনেমা প্রদর্শনী, কুইজ, মুক্তিযোদ্ধার অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। শুরুতে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস এবং ছাত্র-যুবকদের বর্তমান করণীয় বিষয়ে আলোচনা করেন সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি ডাঃ জয়দীপ ভট্টাচার্য। পরবর্তীতে স্বাধীনতার ৫০ বছরে আমাদের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং করণীয় বিষয়ে আলোচনা করেন বাসদ (মার্কসবাদী) জেলা সমন্বয়ক কমরেড শেখর রায়। উক্ত আয়োজনে সভাপতিত্ব করেন সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অজিত দাস, পরিচালনা করেন বাকৃবি শাখার সভাপতি গৌতম কর এবং জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক আরিফুল হাসান। আলোচকরা বলেন, “মুক্তিযুদ্ধ ছিল পাকিস্তানি বৈষম্যমূলক, অগণতান্ত্রিক শাসনের বিরুদ্ধে এদেশের গণমানুষের ঐতিহাসিক লড়াই। সে লড়াইয়ে সবচেয়ে বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে এদেশের ছাত্র সমাজ। ৩০ লক্ষ শহীদের আত্মদানের মধ্য দিয়ে আমরা পেলাম আমাদের স্বাধীনতা। স্বাধীন দেশের শাসকশ্রেণী গণআকাঙ্খার বিপরীতে পুঁজিবাদী কায়দায় দেশ পরিচালনা করতে থাকে। ফলে ৫০ বছরে শোষণ বৈষম্য বেড়েছে বহুগুণ।

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন বাতিলের দাবিতে বাসদ (মার্কসবাদী)-র বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত

গ্রেপ্তারকৃতদের মুক্তি, লেখক মুশতাকের জেল কাস্টডিতে মৃত্যুর তদন্ত ও বিচার এবং কার্টুনিস্ট কিশোরের উপর পুলিশের নির্যাতনের বিচারের দাবিতে বাসদ (মার্কসবাদী) সারাদেশে বিক্ষোভ সমাবেশের ডাক দেয়। ঢাকায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে বিকাল ৪টায় এই বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

কেন্দ্রীয় কার্যপরিচালনা কমিটির সদস্য মানস নন্দীর সভাপতিত্বে ও ঢাকা নগর শাখার ইনচার্জ নাঈমা খালেদ মনিকার পরিচালনায় অনুষ্ঠিত এ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাসদ (মার্কসবাদী) কেন্দ্রীয় কার্যপরিচালনা কমিটির সদস্য আলমগীর হোসেন দুলাল, বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশনের সভাপতি জহিরুল ইসলাম, বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্রের সভাপতি সীমা দত্ত, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি মাসুদ রানা।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, “বাক-স্বাধীনতাবিরোধী ‘ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট’ বাতিলের দাবিতে আন্দোলনমুখর বাংলাদেশ। এই কালো আইনের মাধ্যমে সাংবাদিক-লেখক-কার্টুনিস্ট-শিক্ষক-রাজনৈতিক কর্মী থেকে শুরু করে স্কুলের নবম শ্রেণির ছাত্রকে পর্যন্ত গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। সরকারের বিরুদ্ধে সারাদেশের মানুষের অসন্তোষকে প্রতিবাদে পরিণত হতে দিতে চায় না আওয়ামী লীগ সরকার। করোনাকালীন সময়ে সরকারের অব্যবস্থাপনা ও দুর্নীতির নগ্ন চেহারা প্রকাশের পর থেকে এই আক্রমণ তীব্রতা পেয়েছে।

মুশতাকের মৃত্যুর পর তীব্র আন্দোলনের চাপে পড়ে সরকার কিশোরকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছেন। বক্তারা অন্য বন্দীদের মুক্ত করার জন্য, মুশতাকের মৃত্যু ও কিশোর-মুশতাকের উপর নির্যাতনের বিচারের জন্য এই আন্দোলন তীব্র করার আহ্বান জানান।

নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও গণপরিবহনে ৬০ শতাংশ ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে বাসদ (মার্কসবাদী) ঢাকা নগরের সমাবেশ

বন্ধ ঘোষিত চিনিকল চালু এবং চিনিকল শ্রমিক ও আখচাষিদের জীবন-জীবিকা রক্ষায় 'জাতীয় কনভেনশন ২০২১'

দাবি আদায়ে বৃহত্তর আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা

বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশন এবং বাংলাদেশ ক্ষেতমজুর ও কৃষক সংগঠনের উদ্যোগে ২৭ ফেব্রুয়ারি দিনব্যাপী রংপুর কমিউনিটি সেন্টারে রাষ্ট্রায়ত্ত চিনিকল বন্ধের সিদ্ধান্ত বাতিল, শ্রমিকদের ন্যায্য পাওনা পরিশোধ, আখচাষিদের ক্ষতিপূরণ, করোনা মহামারিকালে কৃষকদের ঋণ মওকুফ, বহুমুখী পণ্য উৎপাদনের মাধ্যমে শ্রমিকদের সারাবছর কাজ নিশ্চিতকরণ, সহজ শর্তে কৃষকদের ঋণ প্রদান, প্রয়োজনীয় কৃষি সরঞ্জাম প্রদান ইত্যাদি দাবিতে জাতীয় কনভেনশন ২০২১ অনুষ্ঠিত হয়।

কনভেনশনে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশনের সভাপতি ও চিনিকল রক্ষা আন্দোলনের সভাপতি জহিরুল ইসলাম। কনভেনশনের শুরুতে দাবি সম্বলিত প্ল্যাকার্ড ও ফেস্টুনে সুসজ্জিত মানুষের একটি মিছিল রংপুর প্রেসক্লাব থেকে শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন এলাকা প্রদক্ষিণ করে। মিছিল শেষে কমিউনিটি সেন্টার মিলনায়তনে আলোচনা পর্ব শুরু হয়।কনভেনশনে বক্তব্য রাখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাউন্টিং এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস বিভাগের শিক্ষক ও গবেষক মোশাহিদা সুলতানা, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক তুহিন ওয়াদুদ, বাংলাদেশ ক্ষেতমজুর ও কৃষক সংগঠনের আহ্বায়ক আলমগীর হোসেন দুলাল, বাসদ (মার্কসবাদী) কেন্দ্রীয় কার্যপরিচালনা কমিটির সদস্য ফখরুদ্দিন কবির আতিক, বাংলাদেশ ক্ষেতমজুর ও কৃষক সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য আহসানুল হাবীব সাঈদ, আনোয়ার হোসেন বাবলু, আহসানুল আরেফিন তিতু, বাংলাদেশ আখচাষি ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় সভাপতি আনছার আলী দুলাল, বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্রের সাধারণ সম্পাদক নীলুফার ইয়াসমীন শিল্পী, চিনিকল শ্রমিক ও আখচাষিদের প্রতিনিধি মো. দুলাল, বাবুল, মো. আতাউর রহমান, মো. বুলু আমিন, রমজান আলী, মো. শাহীদুর রহমান, মো. আব্দুর সাদেক জিহাদী প্রমুখ।

কনভেনশনে বক্তারা বলেন, সরকার এই করোনা মহামারি কালেও দেশে নতুন শিল্প-কারখানা গড়ে তোলার বদলে রাষ্ট্রীয় শিল্প ধ্বংসের এক উন্মত্ত খেলায় মেতে উঠেছে। দেশের ৬টি চিনিকল বন্ধ করেছে সরকার। বন্ধের কারণ হিসেবে বলা হচ্ছে – দীর্ঘদিন ধরে এ খাতে সরকার লোকসান গুনছে। কিন্তু লোকসানের প্রকৃত কারণ কী, লোকসানের জন্য কারা দায়ী – এই বিষয়গুলো সরকার বরাবরের মতো জনগণকে জানতে দেয় না। একটু খতিয়ে দেখলেই স্পষ্ট বোঝা যায়, লোকসানের পেছনের দায় করপোরেশনের কর্তাদের দুর্নীতি-লুটপাট, অব্যবস্থাপনা ও সরকারের পক্ষ থেকে সুষ্ঠু চিনি নীতির অভাব। এর আগে সরকার বন্ধ করেছে রাষ্ট্রায়ত্ত ২৫টি পাটকল। এর মধ্য দিয়ে বেকার হয়েছে স্থায়ী-অস্থায়ী প্রায় লক্ষাধিক শ্রমিক। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে পাট চাষ, বিপণন ও ব্যবসার সাথে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে জড়িত প্রায় ৫০ লক্ষ মানুষ। চিনিকলগুলোতে সরাসরি কর্মসংস্থান রয়েছে ১৬ হাজার লোকের। আর বন্ধ হওয়া ৬টি কলে কর্মরত আছেন ২ হাজার ৮৮৪ জন শ্রমিক-কর্মচারী-কর্মকর্তা। আখচাষে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত আছেন ৫ লাখ কৃষক। সব মিলিয়ে এ খাতে ৫০ লাখ মানুষের জীবন-জীবিকা নির্বাহ হয়। বহু চিনিকলে ৩-৪ মাসের মজুরি ও বেতন বকেয়া পড়েছে। পাওনার দাবিতে শ্রমিকরা প্রায়ই রাস্তায় নামছেন, আন্দোলনে সামিল হচ্ছেন। করোনাকালে বহু মানুষ বেকার কর্মহীন হয়ে পড়েছে, ছাঁটাইয়ের শিকার হচ্ছে। এই সময় দরকার ছিল সামাজিক সুরক্ষার অংশ হিসেবে সরকারিভাবে নতুন নতুন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা। তা না করে উল্টো চিনিকলগুলোকে বন্ধ করে লক্ষ লক্ষ মানুষকে পথে বসানো হচ্ছে।

অথচ কোটি কোটি টাকা বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করে বিদেশ থেকে চিনি আনার বিপরীতে এই মানুষেরাই কাজ করে বৈদেশিক মুদ্রা খরচ বাঁচাচ্ছে। রাষ্ট্র তাদের প্রণোদনা দেবার কথা তো ভাবেনিই, বরং তাদের ন্যায্য হিসাবের পাওনা বেতনও ঠিক সময়ে দিচ্ছে না।

কনভেনশনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের ইনচার্জ ইন্দ্রাণী ভট্টাচার্য সোমাসহ শিল্পীবৃন্দ।

কনভেনশন থেকে নিম্নোক্ত দাবি উত্থাপন ও পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়:

১। এই কনভেনশন অবিলম্বে ৬টি চিনিকল বন্ধের রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবি জানাচ্ছে। কনভেনশন অবিলম্বে চিনিকল শ্রমিকদের সকল বকেয়া মজুরি প্রদান, আখচাষীদের আখের বকেয়া মূল্য পরিশোধ, চিনিকল আধুনিকায়ন করে সারাবছর শ্রমিকদের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করার এবং আখচাষীদের সহজ শর্তে ঋণ প্রদান ও চাষের উপকরণ প্রদানের নিশ্চয়তা দাবি করছে।

বক্তব্য রাখছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক মোশাহিদা সুলতানা

২) সরকার রাষ্ট্রীয় কল-কারখানা বন্ধ করার কারণ হিসেবে অব্যাহত লোকসানের কথা প্রচার করে, কনভেনশন লোকসানের কারণ, পরিমাণ জানিয়ে শ্বেতপত্র প্রকাশের দাবি করছে। লোকসানের দায় শ্রমিক ও আখচাষিদের দিলেও দুর্নীতি-লুটপাটের হিসাব প্রচার মাধ্যমে আসলেও এর জন্য বিচার বিভাগীয় তদন্ত কিংবা দোষীদের শাস্তি দেয়া হয়নি। কনভেনশন দুর্নীতি-লুটপাটের সাথে জড়িতদের শাস্তি দাবি করছে।

৩) চিনিকল রক্ষার আন্দোলন বেগবান করার লক্ষ্যে চিনিকল শ্রমিক, আখচাষি-শ্রমিক সংগঠন, বুদ্ধিজীবীদের সমন্বয়ে সংগ্রাম কমিটি গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করছে এই কনভেনশন।

ঘোষিত কর্মসূচিসমূহ:

ক) চিনিকল ও আখচাষি এলাকায় গণসংযোগ, প্রচারপত্র বিতরণ, মতবিনিময়, সমাবেশ, পদযাত্রা কর্মসূচি পালিত হবে।

খ) ঢাকায় কেন্দ্রীয়ভাবে শ্রমিক, ছাত্র, যুব, নারী, পেশাজীবী সংগঠন ও বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে আগামী মে মাসে "চিনিকলসহ সকল রাষ্ট্রীয় কল-কারখানা রক্ষায় করণীয়" শীর্ষক মতবিনিময় সভা আয়োজন করা হবে।

গ) চিনিকল সংশ্লিষ্ট জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে শ্রমিক, আখচাষি, ছাত্র, যুবক, শিক্ষক, চিকিৎসক, আইনজীবী, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দদের নিয়ে মতবিনিময় সভা আয়োজন করা হবে।

ঘ) চিনিকল শ্রমিক ও আখচাষি রক্ষা সংগ্রাম কমিটি আগামী জুলাইয়ের মাঝামাঝি সময়ে গাইবান্ধা জেলা শহরে চার জন করে প্রতিনিধি, দুই জন আখচাষি ও দুই জন চিনিকল শ্রমিকের অংশগ্রহণে এক কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি সভা অনুষ্ঠিত হবে।

ঙ) ১৫টি চিনিকলের শ্রমিক ও আখচাষিদের যুক্ত করে সেপ্টেম্বরে ঢাকায় বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্যশিল্প করপোরেশন ঘেরাও কর্মসূচি পালিত হবে।

আন্তর্জাতিক নারী দিবসের ডাক

ঘরে-বাইরে-কর্মক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত কর

গত ৮ মার্চ বিকাল ৪টায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্রের উদ্যোগে ঘরে বাইরে কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা এবং সমমর্যাদা ও মত প্রকাশের অবাধ স্বাধীনতা নিশ্চিত

ফেনী

করার দাবি নিয়ে সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয় সভাপতি সীমা দত্তের সভাপতিত্বে সভায় বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ও ঢাকা নগরের সভাপতি তসলিমা আক্তার বিউটি, কেন্দ্রীয় দপ্তর সম্পাদক ও ঢাকা নগরের সদস্য সচিব তৌফিকা লিজা এবং ঢাকা নগর কমিটির সদস্য নাজনিন আক্তার শারমিন।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, ৮ মার্চের ইতিহাসের সাথে সমাজতান্ত্রিক নেত্রী ক্লারা জেটকিনের নাম এবং সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন যুক্ত। কিন্তু আজ আমরা দেখছি ক্লারা জেটকিন কিংবা সমাজতন্ত্রকে পাশ কাটিয়ে, সংগ্রামী তেজকে ম্লান করে দিয়ে উৎসবমুখর পরিবেশে নারী দিবস পালন করা হচ্ছে। অথচ ক্লারা জেটকিনের নেতৃত্বে দেশে দেশে নারীদের সমানাধিকার এবং ভোটাধিকারের দাবিতে গড়ে ওঠা আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ১৯১০ সালে ডেনমার্কের কোপেনহেগেনে ২য় আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ক্লারা জেটকিন প্রতি বছর আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালনের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। স্থির হয় মার্চ মাসের যে কোন একদিন দিবসটি পালন করা হবে। তার ভিত্তিতে অস্ট্রীয়া, ডেনমার্ক, জার্মান এবং সুইজারল্যান্ডের সমাজতান্ত্রিক নারী সংগঠনগুলির উদ্যোগে ১৯১১ সালের ১৯ মার্চ প্রথম আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন করা হয়। পরবর্তীতে নিরাপদ কর্মপরিবেশ, মজুরী বৃদ্ধি এবং কাজের ঘণ্টা কমানোর দাবিতে ১৯০৮ সালের ৮

রংপুর

ঢাকা

মার্চ নিউইয়র্কে দর্জি নারী শ্রমিকরা যে সফল ধর্মঘট করে তাকে স্বীকৃতি দিয়ে ১৯১৪ সালে কোপেনহেগেনের ৩য় আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলনে নির্দিষ্টভাবে শ্রমজীবি নারীর 'সমানাধিকারের দাবি দিবস' হিসাবে ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

বক্তারা আরো বলেন, সরকারের পক্ষ থেকে এবারের নারী দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় ঠিক করা হয়েছে 'করোনাকালে নারী নেতৃত্ব, গড়বে নতুন সমতার বিশ্ব'। অথচ করোনাকালে আমরা দেখেছি শ্রমজীবি নারীসহ সকল শ্রেণী পেশার নারীদের কি ভয়াবহ দুঃসময় পার করতে হয়েছে। কাজ হারানো; আয় কমে যাওয়া; কাজের অনিশ্চয়তা; পারিবারিক সহিংসতা, ধর্ষণ-গণধর্ষণ, নারী নিপীড়ন বৃদ্ধি পাওয়া; শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় নিরাপত্তাহীনতা এবং আর্থিক টানাপোড়নের কারণে বাল্যবিবাহ বেড়ে যাওয়া; ধর্মীয় সভাগুলিতে নারীদের নিয়ে নানা প্রকার আপত্তিকর বক্তব্য রাখা ইত্যাদি নানা ঘটনা প্রমাণ করে এই করোনাকালে বা তার পরবর্তী সময়ে নারী সবচেয়ে বেশী প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবেলা করেছে।

নেতৃবৃন্দ আরো বলেন, পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদ উচ্ছেদ না হলে পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা দূর হবে না। সমাজ থেকে বৈষম্য দূর হবে না। তাই আজ নারী দিবসের যথার্থতা তুলে ধরতে হলে নারী আন্দোলনকে সমাজ পরিবর্তনের পরিপূরক আন্দোলনের লক্ষে পরিচালিত করতে হবে। বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্র এ আন্দোলনকে শক্তিশালী করার জন্য সর্বস্তরের জনগণের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে।

গাইবান্ধা

সাম্যবাদ

করোনা মহামারীতে মহান মে দিবসের তাৎপর্য অপরিসীম

বাংলাদেশে শুরু হয়েছে করোনা মহামারীর দ্বিতীয় ঢেউ। গতবছর লকডাউনে নাজেহাল অবস্থায় পড়েছিল দেশের সব সাধারণ শ্রমজীবী মানুষ। সে সময় সরকার ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজের হাজার হাজার কোটি টাকা মালিক শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করলেও শ্রমিকের কোন কাজে লাগে নি। শিল্প কারখানা, গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিগুলো শ্রমিকদের বকেয়া বেতন পরিশোধ না করেই কারখানা বন্ধ ঘোষণা করেছে, ছাঁটাই করেছে লাখ লাখ শ্রমিককে। অন্য দিকে দেশের শ্রমজীবী মানুষের সবচেয়ে বড় অংশ অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকেরা কর্মহীন হয়ে খেয়ে না খেয়ে দিন কাটিয়েছে। বেসরকারি সংস্থার জরিপে লকডাউনের প্রথমেই প্রায় ১৪% মানুষের ঘরে কোন খাবার ছিল না। বর্তমানে করোনা মহামারী আবার ভয়ংকর চেহারা নেওয়ায় সরকার কোন আগাম প্রস্তুতি ছাড়াই ঘোষণা করেছে লকডাউন। শ্রমজীবী মানুষ কাজ হারিয়ে আরও অসহায়। কৃষকের আত্মহত্যার খবর এসেছে অনলাইন পত্রিকায়। এই পরিস্থিতি সামনে রেখে আবার এ বছর আসছে ১ মে, 'মহান মে দিবস'। শ্রমিকদের অধিকার আদায়ের রক্তাক্ত ইতিহাস গড়ে ওঠার দিনটি। আর এই মহামারী দিনে এই দিবসটি যেন আরো প্রাসঙ্গিক এবং তাৎপর্যপূর্ণ।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ইউরোপ আমেরিকায় মুনাফার লোভে বুর্জোয়া শ্রেণী শ্রমিকদের দিয়ে করাতো অমানবিক পরিশ্রম। কাজের কোন নির্ধারিত সময় ছিল না। এমনকি দৈনিক ২০ ঘন্টাও কাজ করতে হত শ্রমিকদের। এ অবস্থায় পুঁজিবাদী দেশগুলোতে শ্রমঘণ্টা কমানোর দাবীতে গড়ে ওঠে বড় বড় আন্দোলন। শ্রমিকদের এসব আন্দোলন দমন করতে আমেরিকার ফেডারেল কোর্ট ইনজাংশন জারি করে। সে আদেশ অমান্য করে ধর্মঘট করায় ১৮৮৬ সালের এপ্রিল মাসে প্রায় ১৩ শ শ্রমিককে গ্রেফতার করা হয়। এর প্রতিবাদে সে বছর ১ মে তারিখে শিকাগোসহ যুক্তরাষ্ট্রের শহর এবং শিল্পাঞ্চলগুলোতে ধর্মঘট পালন করা হয়। পত্র পত্রিকার তথ্যানুসারে সেদিন সারা দেশে প্রায় সাড়ে তিনলাখ শ্রমিক মিছিল করে। এ সময়ে বিনা কারণে ৩ ও ৪ মে তারখে শ্রমিকদের উপর গুলি চালায় পুলিশ। কিন্তু শ্রমিকদের যারা হত্যা করেছিল তাদের বিচার না করে বিচার শুরু হয় শ্রমিক নেতাদের। প্রহসনের সে বিচারে ফাঁসি দেয়া হয় স্পাইস, ফিশার, এঞ্জেলস ও পার্সন – এই চার মহান শ্রমিক নেতাকে।

এই প্রহসনের বিচারের প্রতিবাদে ঝড় ওঠে ইউরোপ আমেরিকায়। কমিউনিস্ট নেতা মহান ফ্রেডারিখ এঙ্গেলস এর নেতৃত্বে ১৮৮৯ সালের ১৪ জুলাই দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী সমিতির কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। এ কংগ্রেসে সিদ্ধান্ত হয় পরের বছর অর্থাৎ ১৮৯০ সাল থেকে সারাবিশ্বে ১ মে 'আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতি দিবস' হিসেবে পালন করা হবে। তখন থেকেই সারা পৃথিবীর মেহনতী মানুষের কাছে অধিকার আদায়ের লড়াইয়ের প্রেরণার দিন হিসেবে ১ মে পালিত হচ্ছে 'মহান মে দিবস'। শ্রমিক শ্রেণীর মহান নেতা কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিখ এঙ্গেলস এর ডাকে সাড়া দিয়ে সারা বিশ্বের মেহনতী জনতা শ্লোগান তুলেছে 'দুনিয়ার মজদুর এক হও'। তাই মে দিবস শুধু শ্রমিকদের জন্য আনন্দ উদযাপনের দিন নয় বরং শোষণ-বৈষম্য-জুলুমের বিরুদ্ধে লড়াইকে আরো গতিশীল করার শপথ নেয়ার দিন।

দেড়শো বছর আগে যে লড়াই শুরু হয়েছিল তা আজও অব্যাহত। পুঁজিবাদী নিয়মে অর্থনীতির চাকা সচল রাখে দেশের শ্রমজীবী মানুষ। অথচ এ ব্যবস্থায় সবচেয়ে অবহেলিত এই শ্রমিকেরাই। আজ থেকে আট বছর আগে এই এপ্রিল মাসের ২৪ তারিখে ঘটে বাংলাদেশের সাভারে রানা প্লাজা গার্মেন্ট ধ্বসের ঘটনা। ১১শ'র বেশি পোশাক শ্রমিকের মৃত্যুর ঘটনা ছিল শুধু বাংলাদেশের নয়, বিশ্ব-ইতিহাসেরই অন্যতম ভয়াবহ শিল্প-দুর্ঘটনা। এটা নিছক দুর্ঘটনা নয়। রানা প্লাজা এক নৃশংস হত্যাকাণ্ড, এক ভয়ংকর গণহত্যা। ভবনে ফাটল ধরার পরও শ্রমিকদের ডেকে এনে জোর করে কাজ করানো হয়েছে। এখন এও জানা যাচ্ছে যে ওই ভবন কোনো নিয়ম-নীতি মেনে তৈরি করা হয়নি। রানা প্লাজার কয়েক হাজার শ্রমিক মুনাফার শিকার হয়ে জীবন হারিয়েছেন, পঙ্গু হয়ে বেঁচে আছে আরও অনেকে। গত আট বছরেও এই হত্যাকাণ্ডের কোন বিচার হয়নি। এর আগে ২০১৪ সালে নভেম্বর মাসে আশুলিয়ায় তাজরীন গার্মেন্টসে অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে মারা যান ১২৪ জন শ্রমিক। একইভাবে ২০০৫ সালের ১০ এপ্রিল রাতে এই সাভারেই স্পেকট্রাম নামের ৮ তলা ভবন ধ্বসে আনুমানিক ৩ শত শ্রমিক নিহত হয়। ওই ঘটনার জন্য দায়ী মালিক-কর্তৃপক্ষের কোনো শাস্তি হয়নি। বিচার হয়নি ২০০৬ সালে চট্টগ্রামের কেটিএস এপারেল-এ শ্রমিক হত্যার। গেট আর অপরিসর সিঁড়ির কারণে শ্রমিকরা বেরুতে পারে না। শ্বাসরুদ্ধ হয়ে, পদদলিত হয়ে, আগুনে পুড়ে মরে। কখনো ভবন ধ্বসে পড়ে, কিছু বুঝে ওঠার আগেই চাপা পড়ে শত প্রাণ। প্রতিটি ঘটনায় গণহারে শ্রমিক মারা গেছে, অথচ কোন ঘটনাতেই মালিকের বিচার হয়নি।

রাষ্ট্রের কাছে শ্রমিকের জীবনের যেন কোন মূল্যই নেই। আর এই মহামারীতে তা অন্য যে কোন সময়ের চাইতে আরো বেশি স্পষ্ট করে বোঝা যাচ্ছে। করোনা পরিস্থিতির শুরুতে অপরিকল্পিত লকডাউনে বিপর্যস্ত শ্রমিকেরা সমস্ত বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিয়েই কাজ করেছে কল কারাখানায়, অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে। করোনা মহামারীর আঘাতে পুরো বিশ্বের অর্থনীতিই যখন টালমাটাল সে অবস্থাতেও বাংলাদেশের অর্থনীতির চাকা সচল রেখেছে এদেশের সাধারণ শ্রমজীবী মানুষ। সবমিলিয়ে চলতি ২০২০-২১ অর্থবছরের প্রথম পাঁচ মাসে (জুলাই-নভেম্বর) এক হাজার ৫৯২ কোটি ৩৫ লাখ ডলারের পণ্য রপ্তানি করেছে বাংলাদেশ, যা গত বছরের একই সময়ের চেয়ে প্রায় ১ শতাংশ বেশি। অনেক দেশেই কাজ হারিয়েছেন অভিবাসী কর্মীরা। সরকারি হিসাবে গত ১ এপ্রিল থেকে ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত ৩ লাখ ২৬ হাজার ৭৫৮ জন প্রবাসী কর্মী দেশে ফিরে এসেছেন। সব মিলিয়ে ২০২০ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ২৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ে রেমিটেন্স বাবদে দেশে এসেছে ২১ দশমিক ৪০ বিলিয়ন ডলার, যা ২০১৯ সালের পুরো সময়ের চেয়ে ১৭ দশমিক ৭৫ শতাংশ বেশি।

পুঁজিবাদের নিয়মে যেমন অর্থনীতির চাকা সচল রাখে শ্রমজীবী মানুষ তেমনি লাভের অংশ ভোগ করে মালিকেরা। ২০১৬ সালে গ্লোবাল ফাইন্যান্সিয়াল ইনটিগ্রিটি-জিএফআই এর তথ্য নিয়ে সিপিডি তাদের এক গবেষণা প্রতিবেদনে বলেছে, ১০ বছরে সাড়ে ছয় লাখ কোটি টাকা বিদেশ পাচার হয়েছে। এ টাকা তৈরি হয়েছে শ্রমিকের রক্তে ঘামে আর পাচার করছে মালিকেরা। মহামারীর এই মানবিক বিপর্যয়ের সময়েও লাভের অংক বেড়েছে মালিকদেরই। হিসাব মতে দেশে নতুন কোটিপতিই তৈরি হয়েছে সাড়ে ৩ হাজার। শ্রমিকের স্বাস্থ্যঝুঁকির তোয়াক্কা না করে খোলা রাখা হয়েছে গার্মেন্টসসহ বিভিন্ন ধরনের কল-কারখানা। এই সময়ে আবার ১০,০০০/- কোটি টাকা প্রণোদনা প্যাকেজও দাবি করেছে গার্মেন্টস মালিকেরা। অন্যদিকে অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিকদের আবারো লকডাউনে দিশেহারা অবস্থা তৈরি হয়েছে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) সর্বশেষ শ্রমশক্তি জরিপ (২০১৭) অনুযায়ী, দেশের ৮৫ শতাংশ কর্মজীবী লোক এমন অনানুষ্ঠানিক খাতে কাজ করেন। দেশে মোট ৬ কোটি ৮ লাখ লোক মজুরির বিনিময়ে কোনো না কোনো কাজে আছেন। এর মধ্যে ৫ কোটি ১৭ লাখ ৪ হাজারই কাজের কোন নিশ্চয়তা নেই এমন কাজ করেন। গত লকডাউনে করোনায় অবশ্য তাঁদের জীবিকাই সবচেয়ে হুমকিতে পড়েছে। গত লকডাউনে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য, যোগাযোগ সবকিছু প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। শহর-গ্রামনির্বিশেষে দিন আনে দিন খায় অসহায় মানুষেরাই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হন, তাঁদের অনেকের রোজগার বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সে সময় রাজধানীসহ বড় বড় শহরের রিকশাচালক, গৃহকর্মী, হোটেল কর্মী, বাস-টেম্পোচালকসহ হাজার হাজার শ্রমিক বেকার হয়ে পড়েছেন। ফলে তাঁরা গ্রামে গিয়েছেন বাড়ি ভাড়া দিতে না পেরে বা নতুন কাজের সন্ধানে।

কিন্তু সংসার চালাতে গিয়ে বেশির ভাগই সে সময় ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েন। গতবছরের ঋণ শোধ হয়নি এখনো। এরই মধ্যে আবার লকডাউন শুরু হয়েছে। কোনো কাজ পাচ্ছেন না তাঁরা। কিন্তু গতবারের অভিজ্ঞতায় তাঁরা এবার আর ঢাকা ছেড়ে যেতে চাচ্ছেন না। তাঁদের কপালে দুশ্চিন্তার ভাঁজ। আরো ভয়ংকর অসহায় অবস্থায় পড়তে যাচ্ছেন তারা। নগদ অর্থ এবং খাদ্য সহায়তা প্রদান ছাড়া এই সব শ্রমিকদের অনাহারে মৃত্যু ভিন্ন অন্যকোন উপায় থাকবে না।

এই করোনা বিপর্যয় কালে তাই মহান মে দিবসকে তাৎপর্যপূর্ণ করতে হলে শ্রমিকদের অধিকার আদায়ে আন্দোলন ভিন্ন অন্য কোন উপায় নেই। অন্যদিকে, সাধারণ সময়েও নামমাত্র মজুরি ছাড়া উৎপাদনের সুফল শ্রমিকেরা পায় না। পুঁজিবাদী সমাজে উদ্বৃত্ত সম্পদের সিংহভাগ ভোগ করে মালিকেরা। তাদের হাতেই মূলত রাষ্ট্র-আইন-পুলিশ-বিচারবিভাগ সবকিছু। শ্রমিকদের এই দুঃসহ শোষণ থেকে মুক্তি দিতে হলে পুঁজিবাদ উচ্ছেদ করার সংগ্রাম গড়ে তুলতে হবে। আর সেই সংগ্রামের প্রেরণা হিসেবেই উদযাপন করতে হবে মহান মে দিবস।

মায়ানমারে সেনা অভ্যুত্থান বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলন

মায়ানমারে গত ১লা ফেব্রুয়ারী নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের বন্দী করে দেশটির সেনাবাহিনী আবারও ক্ষমতা দখল করেছে। অভ্যুত্থানের পর থেকে গণতন্ত্রকামী মানুষ সেনাশাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করতে থাকে। বিক্ষোভ দমনে প্রতিদিন সেনাবাহিনী-পুলিশ নির্বিচারে সাধারণ বিক্ষোভকারীদের উপর গুলি চালাচ্ছে। গত ২৭ মার্চ একদিনেই দেশটিতে নিহত হয়েছে ১১৪ জন বিক্ষোভকারী। এ পর্যন্ত পাঁচ শতাধিক মানুষ নিহত হয়েছে। হাজার হাজার বিক্ষোভকারীকে গ্রেফতার করেছে। এত নিপীড়ন নির্যাতনেও থেমে নেই আন্দোলন। বিক্ষোভকারীরা প্রতিদিন নতুন শক্তি ও কৌশলে আন্দোলন জোরদার করছে।

গণতন্ত্রের জন্য মায়ানমারের জনগণের সংগ্রাম নতুন নয়। দেশটি ১৯৪৮ সালে ব্রিটিশদের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভ করে। স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকে এখন পর্যন্ত প্রায় পুরো সময় দেশটিতে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে সেনাবাহিনী ক্ষমতা দখল করে ছিল। শুধু রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই নয় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সেনাবাহিনী একচ্ছত্র আধিপত্য কায়েম করেছে। দেশটির শীর্ষ পুঁজিপতিদের অধিকাংশই সাবেক বর্তমান সেনা কর্মকর্তা। এছাড়াও দেশটির ব্যবসা-বাণিজ্য অনেকাংশেই সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে। অপরদিকে জনগণের রাজনৈতিক গণতান্ত্রিক অধিকারকে বরাবর সংকুচিত নিয়ন্ত্রিত করেছে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবিতে বিভিন্ন সময় জনগণ রক্তক্ষয়ী আন্দোলনে সামিল হয়েছে। ১৯৮৮ সালে সরকার বিরোধী আন্দোলনে কয়েক হাজার মানুষকে গুলি করে হত্যা করা হয়। একইভাবে ২০০৭ সালে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের নেতৃত্বে পরিচালিত আন্দোলনেও হত্যা নির্যাতন চালায় সেনাবাহিনী। গণ-আকাঙ্ক্ষার বিপরীতে স্বৈরাচারী কায়দায় দেশ পরিচালনা করার স্বার্থে সেনা শাসকরা জনগণকে বিভক্ত করেছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ বামার জাতিগোষ্ঠীর সাথে কারেন, শান, রোহিঙ্গা ইত্যাদি জাতির জাতিগত দ্বন্দ্ব তীব্র করেছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ বৌদ্ধ ধর্মানুসারী মানুষের মধ্যে ধর্মীয় উন্মাদনা তৈরি করে ধর্মীয় সংখ্যালঘু মানুষের উপর বর্বর নিপীড়ন চালিয়েছে। যার ফলশ্রুতিতে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর উপর ভয়াবহ আক্রমণ করে তাদের দেশ থেকে বিতাড়িত করেছে। লক্ষ লক্ষ রোহিঙ্গা আজ তাদের বাসস্থান হারিয়ে আমাদের দেশে উদ্বাস্তু হয়ে অবস্থান করছে। জনগণের আকাঙ্ক্ষার বিপরীতে দেশ পরিচালনা করতে গিয়ে সেনা শাসকরা বারবার সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর কাছে নতজানু হয়েছে। বিশেষত মায়ানমারের প্রতিবেশী সাম্রাজ্যবাদী চীন তার ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থে সেনাশাসনকে সবসময় সমর্থন সহযোগিতা করেছে। চীন তার 'বেল্ট এন্ড রোড ইনিশিয়েটিভ' এর জন্য মায়ানমারের ভিতর দিয়ে বঙ্গোপসাগরের সাথে সংযোগ স্থাপনের কাজ অনেকদূর অগ্রসর করেছে। আরাকান রাজ্যে গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মাণে চীন ছিল মুখ্য বিনিয়োগকারী। এই বন্দরে চীনকে ৭০ ভাগ মালিকানা দিয়েছে মিয়ানমার সরকার। এছাড়াও আরাকান থেকে চীনের ইউনান পর্যন্ত ২৩৮০ কিলোমিটার দীর্ঘ গ্যাস পাইপলাইন নির্মাণ করছে চীন। গ্যাসের জন্য চীন অনেকাংশে মায়ানমারের উপর নির্ভরশীল।

> আমাদের দেশেও গত প্রায় এক দশক ধরে ভোট ডাকাতির মাধ্যমে আওয়ামীলীগ সরকার স্বৈরাচারী শাসন কায়েম করেছে। আমাদের দেশের জনগণও গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ে লড়াই করছে। ফলে মায়ানমারে চলমান গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের আন্দোলনে এদেশের সমর্থন আছে। কিন্তু গত ২৭ মার্চ মায়ানমারের সশস্ত্র বাহিনী দিবসের অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি উপস্থিত থাকার মধ্য দিয়ে প্রকারান্তরে সেনাশাসকদের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে

দেশটির বিদেশি বিনিয়োগের সিংহভাগই চীনের। একইভাবে ভারত তার উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যসমূহে যোগাযোগ ও বাণিজ্যের স্বার্থে মায়ানমারের সেনাশাসনকে সমর্থন করে। এছাড়াও অস্ত্র ক্রয়সহ নানা বাণিজ্যিক সুবিধা দিয়ে সেনাশাসকরা রাশিয়াসহ পৃথিবীর অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর সমর্থন আদায় করে। চীন এক্ষেত্রে সবচেয়ে প্রভাবশালী এবং সেনাশাসকদের নিরবচ্ছিন্ন সমর্থক। ফলে চলমান সেনাশাসন বিরোধী আন্দোলনে চীন বিরোধিতা চোখে পড়ার মত।

জনগণের দীর্ঘ সেনাশাসন বিরোধী আন্দোলন এবং পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর চাপে ২০১৫ সালে দেশটিতে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে অং সাং সুচীর নেতৃত্বাধীন এনএলডি জোট ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। যদিও দেশটির সংবিধানে সংসদের ২৫ ভাগ আসন এবং দেশটির স্বরাষ্ট্র, প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সেনাবাহিনীর জন্য সংরক্ষিত। সংবিধান পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয় ৭৫ শতাংশের অধিক আসন বেসামরিক সরকারের হাতে না থাকায় সেনাবাহিনীর মূল ক্ষমতা কাঠামোয় কোন পরিবর্তন আসেনি। গত বছরের নভেম্বরে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ৪১২ আসনের মধ্যে ৩৪৬টিতে বিজয়ী হয় অং সাং সুচীর নেতৃত্বাধীন এনএলডি এবং সেনা-সমর্থিত ইউএসডিপি জিতেছিল ৩৩ আসনে। এ নির্বাচনের পর রাষ্ট্রপতি কে হবে এ নিয়ে সেনাপ্রধান মিন অ্লাইয়াং এবং অং সাং সুচীর মধ্যে দ্বন্দ্বের জেরে সেনাবাহিনী আবারও গত ১লা ফেব্রুয়ারী ক্ষমতা দখল করে। অং সাং সুচী সহ নির্বাচিত প্রায় সকল জনপ্রতিনিধিদের গ্রেফতার করে।

রোহিঙ্গা সংকটের পর বর্তমান সেনা অভ্যুত্থান এবং আন্দোলনকে কেন্দ্র করে মায়ানমার আবারও আমাদের দেশে আলোচিত হচ্ছে। ২০১৭ সালে মায়ানমার সেনাবাহিনীর বর্বর নিপীড়নে প্রায় ১০ লক্ষ রোহিঙ্গা শরণার্থী বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়। আমাদের দেশের সরকার আশ্রয় দিলেও রোহিঙ্গা প্রত্যাবসনের জন্য মায়ানমারের উপর কার্যকর কোন চাপ তৈরি করতে পারেনি। সেনা অভ্যুত্থানের ফলে রোহিঙ্গা প্রত্যাবসন প্রক্রিয়া আরও দীর্ঘায়িত হতে পারে। আমাদের দেশেও গত প্রায় এক দশক ধরে ভোট ডাকাতির মাধ্যমে আওয়ামীলীগ সরকার স্বৈরাচারী শাসন কায়েম করেছে। আমাদের দেশের জনগণও গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ে লড়াই করছে। ফলে মায়ানমারে চলমান গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের আন্দোলনে এদেশের জনগণের সমর্থন আছে। কিন্তু গত ২৭ মার্চ মায়ানমারের সশস্ত্র বাহিনী দিবসের অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি উপস্থিত থাকার মধ্য দিয়ে প্রকারান্তরে সেনাশাসকদের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে। সেখানে চীন, রাশিয়া, ভারতের মত সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর সাথে বাংলাদেশের প্রতিনিধি অংশ নেয়। এ ঘটনার মাধ্যমে বোঝা যায় এ অঞ্চলের বিভিন্ন দেশের শাসকশ্রেণী, হোক সে মায়ানমারের সেনাশাসক, বাংলাদেশের ভোট ডাকাতির সরকার বা তথাকথিত বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ ভারতের ফ্যাসিস্ট মোদি সরকার এদের মধ্যে একটা ঐক্য আছে। কি সে ঐক্য? তাদের ঐক্য হচ্ছে শোষণ-লুটপাট নির্বিঘ্ন করার, জনগণকে নিপীড়ন-নির্যাতন-বিভক্ত করার ঐক্য। শাসকদের ঐক্য থাকলেও নিপীড়িত মানুষের কার্যকর কোন ঐক্য নেই। দেশে দেশে ফ্যাসিবাদ বিরোধী লড়াইয়ের জন্য নিপীড়িত মানুষের ঐক্য আজ অপরিহার্য। মায়ানমারের গণতন্ত্রকামী মানুষ প্রতিদিন বুকের রক্ত দিয়ে ফ্যাসিস্ট সেনাশাসনের বিরুদ্ধে লড়ছে। আমাদের দেশের প্রতিটি গণতন্ত্রমনা মানুষের উচিত তাদের লড়াইয়ের পাশে দাঁড়ানো। মায়ানমারের জনগণের মরণপণ সংগ্রাম এ অঞ্চলে নিপীড়িত মানুষকে গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের আন্দোলনে প্রেরণা যোগাবে।

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন কার

চলচ্চিত্র পরিচালক, গার্মেন্টসকর্মী থেকে শিক্ষক ও ছাত্রদের এ আইনে মামলা করা হয়। এবং এসব মামলার এজাহার খুব ঠুনকো। 'মানহানি' 'কটুক্তি' 'অপপ্রচার' ইত্যাদি শব্দগুচ্ছ এখানে ব্যবহার করা হয়েছে আর মামলার বাদী বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ ও তার অঙ্গসংগঠনের নেতা-কর্মী পুলিশ ও র‍্যাব।

আওয়ামী লীগ সরকার কেন এই ধরনের আইন করলো

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের অধ্যাপক ডঃ মিজানুর রহমানের কথায় আমরা এর উত্তর পাবো। তিনি বলেছেন "কর্তৃত্ববাদী মানসিকতা এভাবে আইনের প্রয়োগ এবং অপব্যবহার অসহিষ্ণুতার লক্ষণ। আর সরকার তখনই অসহিষ্ণু হয় যখন সে বুঝে তার শাসন ব্যবস্থায় মারাত্মক গলদ দেখা দিয়েছে।" (ডয়েচে ভেলে ২৬-৬-২০২০) শাসন ব্যবস্থায় মারাত্মক এই গলদটা কি? গলদটা হলো, এই সরকার গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকার নয়। সে অবৈধভাবে ক্ষমতা কুক্ষিগত করেছে। এটা করতে গিয়ে দুটি এমন নির্বাচন তাকে করতে হয়েছে যার একটি বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় (ভোট ছাড়াই ১৫৪ আসনে নির্বাচিত) আরেকটি রাতের অন্ধকারে ভোট জালিয়াতির মাধ্যমে। এই দুই নির্বাচনে সাধারণ জনগণ অংশগ্রহণ করতে পারেনি সেটা জনগণ তো জানেই আওয়ামী লীগের লোকজন নিজেরাও জানে তারা কি করছে। ফলে জনগণের মধ্যে স্লোগান উঠেছে, 'এরশাদ গেছে যে পথে হাসিনা যাবে সে পথে', 'আয়ুইব গেছে যে পথে হাসিনা যাবে সে পথে'। এই সময়ের গুমের ঘটনা, বিনাবিচারে জেলে আটকে রাখা, ক্রসফায়ার, ব্যাংক ও আর্থিক খাতের দুর্নীতি সম্পদ পাচার নারী-শিশু নির্যাতন ধর্ষণ, করোনাকালীন সময়ে চুরি-দুর্নীতি, পিপিই-মাস্ক কেলেঙ্কারি নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মানুষ কথা বলছে। পত্রপত্রিকায় এগুলো নিয়ে রিপোর্ট হচ্ছে। এবং অবৈধভাবে ক্ষমতায় থাকার ফলে সরকারের বিরুদ্ধে এই ক্ষোভ আরো বাড়ছে। এরকম জনবিক্ষোভকে আওয়ামী লীগ সরকার ভয় পাবে এটাই স্বাভাবিক। ফলে যারা অবৈধ সরকারের চুরি-দুর্নীতির কথা বলবে, সংবাদ মাধ্যমে প্রচার করবে। ফলে তাদের দমন করার জন্যই ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ তৈরি করা হয়েছে।

এই আইন জনগণের বিরুদ্ধে কিন্তু কার পক্ষে?

গত ৫০ বছরে এদেশে একশ্রেণীর পুঁজিপতির জন্ম হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে এখানে একটা পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের জন্ম হওয়ার কারণেই এটা হয়েছে। তাই গত ৫০ বছরে এই পুঁজি প্রথমে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় পরবর্তীতে ব্যক্তি উদ্যোগে ফুলে-ফেঁপে ওঠে আজকের দিনে একচেটিয়া পুঁজির দিকে ক্রমাগত এগুচ্ছে। আজকের দিনে এই একচেটিয়া পুঁজি এবং পুঁজিপতিদের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য দরকার একটা 'নির্বিঘ্ন পরিবেশ'। এই 'নির্বিঘ্ন পরিবেশ'টা তৈরি করছে আওয়ামী লীগ সরকার। ফলে আওয়ামী লীগ সরকারকে তারা ব্যাক করছে এবং তারা চায় এই পরিবেশটা বজায় থাকুক। তাদের এই আকাঙ্ক্ষাই আওয়ামী লীগের মধ্যে ২০৪১ সাল পর্যন্ত ক্ষমতায় থাকার উচ্চাকাঙ্ক্ষা তৈরি করছে। সেভাবে তারা পরিকল্পনা সাজাচ্ছে।

কিন্তু ইতিহাস কি কখনো একদেশদর্শী হয়। একটা সমাজ একটা রাষ্ট্র আছে মানে সেখানে দুটো শ্রেণি আছে। ফলে বিজ্ঞানভিত্তিক ভাবে পুঁজিপতিদের স্বার্থের বিপরীতে অর্থনৈতিকভাবে আরেকটা শ্রেণি আছে। তারা হল শ্রমিক শ্রেণী, এই শ্রমিক শ্রেণীর সাথে আছে কৃষক-মজুর, ছাত্র, দোকানদার, শিক্ষক, হকার বুদ্ধিজীবী প্রমুখ মধ্যবিত্ত নিম্নমধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত মানুষ। এই দুই শ্রেণীর স্বার্থ অভিন্ন। পুঁজিপতিরা আওয়ামীলীগকে সামনে রেখে এগুচ্ছে এর মানে বুঝতে হবে। এই পুঁজিপতিদের স্বার্থেই তাদের নির্বিঘ্ন পরিবেশ তৈরী করতেই ২০১৪ এবং ২০১৮ সালের মতো নির্বাচন তাদের করতে হয়। পুঁজিপতিদের লুটপাট, টাকা পাচার, ইত্যাদির বিরুদ্ধে যখন কথা উঠবে তখন তাদের মুখ বন্ধ করতে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন তৈরি তাদের করতে হয়। এর বিপরীতে শ্রমিক শ্রেণী এবং তার সাথে মিলিয়ে কৃষক-মজুর, ছাত্র, দোকানদার, শিক্ষক, মুচি, মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ তাদের স্বার্থের বিরুদ্ধে কথা বলবে, আন্দোলন গড়ে তুলবে এটাই সমাজপ্রগতির নিয়ম। কোনোকালেই এই নিয়মের ব্যত্যয় ঘটে না। বিজ্ঞানভিত্তিক এই নিয়মের প্রতি আমাদের আস্থা।

জনগণের করণীয়

শুভবুদ্ধি সম্পন্ন গণতান্ত্রিক, দেশকে যারা ভালোবাসেন, মুক্তিযুদ্ধকে যারা আবেগে ধারণ করেন এরকম মানুষদের কাছে আমাদের আবেদন বর্তমানে বাংলাদেশে জগদ্দল পাথরের মতো যে সরকার বসে আছে তাকে উচ্ছেদ করতে হলে জনগণের গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে জোরদার করতে হবে। ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন বাতিলের আন্দোলন, গুম, খুন, ক্রসফায়ার বিরোধী আন্দোলন, আর্থিক খাতে দুর্নীতি-লুটপাট, অব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলুন। প্রত্যেক শ্রেণি-পেশার মানুষ যারা তার নিজ নিজ পেশায় শোষিত-বঞ্চিত সে পেশার মানুষকে সংগঠিত করুন। একটা লড়াইয়ের মনোভাব নিজেদের মধ্যে তৈরি করুন। সংগঠিত হওয়ার মধ্য দিয়ে এই মনোভাব অপরের মধ্যে ছড়িয়ে দিন। এভাবে জনগণের রাজনৈতিক নেতৃত্বের জন্ম দিতে হবে। রাজনৈতিক নেতৃত্ব তৈরিতে আমাদের দল বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল মার্কসবাদী আপনাদের পাশে থেকে ভূমিকা পালন করবে।

সাম্রাজ্যবাদী ভারতের শোষণ

এশিয়ায় সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্য বিস্তার করছে। নরেন্দ্র মোদী হিন্দুত্ববাদী উগ্রতা ছড়িয়ে ভারতসহ দক্ষিণ এশিয়ার শোষিত জনগণের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিভাজন ও বিদ্বেষ বাড়িয়ে তোলার চেষ্টা করছে। ভারত সরকার নিজেদের স্বার্থ অক্ষুণ্ন রাখতে বাংলাদেশ, নেপাল, শ্রীলংকাসহ এ অঞ্চলের বিভিন্ন দেশের আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে নগ্ন হস্তক্ষেপ করছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সাথে ভারতের আঁতাত ও ভারত-চীন সাম্রাজ্যবাদী দ্বন্দ্ব এ অঞ্চলের নিরাপত্তা ও শান্তির জন্য হুমকি সৃষ্টি করছে। বাংলাদেশের অনির্বাচিত আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে ভারতকে ট্রানজিট-বন্দর-নিরাপত্তা সহযোগিতাসহ একতরফা নানা সুবিধা দিলেও বাংলাদেশের জনগণের স্বার্থ আদায় করতে সক্ষম হয়নি। ফলে, মোদীর নেতৃত্বাধীন ভারত সরকার শেখ হাসিনার বন্ধু হলেও বাংলাদেশের জনগণের বন্ধু নয়।

১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারতের জনগণের সহযোগিতা ও অবদান আমরা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি। কিন্তু, স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী অনুষ্ঠানে হিন্দুত্ববাদী বিজেপি নেতা নরেন্দ্র মোদীকে আমন্ত্রণ জানানো মুক্তিযুদ্ধের ধর্মনিরপেক্ষ ও অসাম্প্রদায়িক চেতনার বিরোধী। গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালে এই নরেন্দ্র মোদীর পৃষ্ঠপোষকতায় সংঘটিত সাম্প্রদায়িক আক্রমণে হাজারো মানুষকে হত্যা করেছিল বিজেপি-আরএসএস। ভারতে তার নেতৃত্বে বিজেপি 'বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী' বিতাড়নের নামে বাংলাদেশ বিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। এনআরসি-এর নামে আসামে ২০ লক্ষ নাগরিকের নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়া হয়েছে। এনআরসি বিরোধী আন্দোলন দমনে দিল্লীতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগানো হয়েছে। ভারতে চলমান ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলনসহ সেদেশের জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকারের ওপর আক্রমণ চালাচ্ছে ফ্যাসিস্ট বিজেপি সরকার। ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদের শিরোমণি সাম্প্রদায়িকতাবাদী ফ্যাসিস্ট নরেন্দ্র মোদীর বাংলাদেশে আগমনের প্রতিবাদ জানানো গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন মানুষের নৈতিক দায়িত্ব ও আইনসঙ্গত অধিকার। প্রগতিশীল ছাত্রসংগঠন ও বাম জোটের মোদীবিরোধী কর্মসূচিতে হামলা-বাধা প্রদান-গ্রেপ্তারের মাধ্যমে নাগরিক অধিকার ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেছে সরকার। একইসাথে তারা প্রমাণ করেছে, এই সরকার মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও বাংলাদেশের স্বার্থের চাইতে মোদীর 'ভাবমূর্তি' রক্ষায় ও ভারত সরকারের প্রিয়ভাজন হতে অধিক আগ্রহী।

লড়েছে।

বিপর্যস্ত শিক্ষা ব্যবস্থা বনাম

এতে শিক্ষা বৈষম্য বাড়বে; একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। এ দুর্যোগ পরিস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন বা রাষ্ট্রের দায়িত্ব ছিলো শিক্ষার্থীদের অর্থনৈতিক-মানসিক-একাডেমিকভাবে সহযোগিতা করা। শিক্ষার্থীরা কতটা সংকটে আছে তা বোঝাতে একটা উদাহরণই যথেষ্ট; করোনাকালে শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েরই ১৩ জন শিক্ষার্থী আত্মহত্যা করেছে। এর দায় কি প্রশাসন কিংবা সরকার এড়াতে পারেন?

এত সংকটের মধ্যেও বিভাগগুলো থেকে ফোন করে, শিক্ষার্থীদের ডেকে এনে পরবর্তী বর্ষে ভর্তি করানো হচ্ছে। চলছে ফরম ফিলাপ, বেতন-ফি আদায়। বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ কিন্তু থেমে নেই টাকা আদায়। করোনার মধ্যেও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে, বিভিন্ন বিভাগগুলোতে সেমিস্টার-ইয়ার ফাইনাল পরীক্ষা নেয়া হয়েছে। অথচ আবাসিক হলগুলো খোলা হয়নি। প্রশাসনের পক্ষ থেকে একবারের জন্যও ভাবা হয়নি, এসব শিক্ষার্থী কোথায় অবস্থান করবে কীভাবে পরীক্ষা দেবে? উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠান হিসেবে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও সাত কলেজের শিক্ষার্থীদেরও একই রকম সংকটের মধ্য দিয়ে যেতে হচ্ছে। প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে কিন্তু থেমে নেই ভর্তি কিংবা পরীক্ষা।

পেছনের উদ্দেশ্য মোটেও শিক্ষা নয়, উদ্দেশ্য ব্যবসা। একথা খুব সহজেই বোঝা যায়। এসময় অনেক শিক্ষার্থী পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তির অনিশ্চিত যাত্রা থেকে রক্ষা পেতে এসব প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হচ্ছে। অনেকে সেমিস্টার ফি দিতে না পারায় লেখাপড়া ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে। এরকম শিক্ষার্থীর সংখ্যা নেহায়েত কম নয়।

প্রাসঙ্গিকভাবে এখানে অনলাইন শিক্ষার বিষয়টি আলোচনার দাবি রাখে। আপাত সংকট মোকাবেলায় অনলাইন শিক্ষা চালু হলেও এর দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব শিক্ষাক্ষেত্রে ভয়ানক সংকট তৈরি করবে। এ সংকট শুধু ব্যবহারিক নয়, দর্শনগতও। একজন শিক্ষার্থী ভধপব ঃড় ভধপব শিক্ষার মাধ্যমে নিজস্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে গভীরভাবে যুক্ত হয়। শিক্ষকদের কাছ থেকে একাডেমিক শিক্ষার পাশাপাশি বিভিন্ন বিষয়ে সঠিক-বেঠিক, ন্যায়-অন্যায়ের ধারণা লাভ করে। অনলাইন শিক্ষায় তা অনুপস্থিত। সাম্প্রতিক সময় ও পরিস্থিতিতে ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকে অনলাইন শিক্ষাকে 'কনটেন্ট নির্ভর' পড়াশোনা হিসেবে পরিচিত করানো হচ্ছে এবং এর পক্ষে জোর প্রচার চালানো হচ্ছে। কম বিনিয়োগ, কম শিক্ষক নিয়োগ করে বেশি মুনাফার ধারণা- এটাকেই ব্যবসায়িক গোষ্ঠী নাম দিয়েছে 'ভার্চুয়াল ইউনিভার্সিটি '।

পুঁজিবাদের দুনিয়াব্যাপী বাজার সংকট। তাই এরা রাষ্ট্রীয় খাত বা মৌলিক অধিকারসমূহকেও ব্যবসার আওতায় এনে কিছুটা রিলিফ পেতে চায়। এই উদ্দেশ্যেই অনলাইন শিক্ষাকেও প্রয়োজনীয় করে তুলে ধরা হচ্ছে। অদূর ভবিষ্যতে পৃথিবীব্যাপী শুধু অনলাইন শিক্ষাব্যবসা থেকে মুনাফা হবে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার। এভাবেই দুর্যোগের সুযোগ নিয়ে পুঁজিপতি গোষ্ঠী মুনাফার ফাঁদ পেতে বসে আছে।

শিক্ষার্থীদের সাথে সাথে ভালো নেই শিক্ষকরাও। ভয়ানক সংকটে পড়েছে নন-এমপিওভূক্ত ১০ লাখ শিক্ষকের জীবন-জীবিকা। কিন্ডারগার্টেনের প্রায় ৬ লাখ এবং বেসরকারি কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রায় ২.৫০ লাখ শিক্ষকও ভালো নেই। এসব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত অনেক সংখ্যক কর্মকর্তা-কর্মচারী। সরকারের পক্ষ থেকে তাদের জন্য কোন প্রনোদনা বা সহায়তার ব্যবস্থাই করা হয়নি।

করোনাকালে শিক্ষাক্ষেত্রের এই যে সংকট তা ছিলো অবশ্যম্ভাবী । এর কারণ কাঠামোগত সংকট। কাঠামোগত সংকটের ফলাফল কাঠামোর মধ্যেই নিহিত থাকে। এর পুরো প্রক্রিয়া চলে দীর্ঘমেয়াদে। তাই অনেক সময় একে স্বাভাবিক মনে হয়, মানুষ মেনে নেয়। তাই জনগনের অসচেতন অংশ এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে না। এখন একথা স্পষ্ট করে বলা চলে; এই কাঠামোগত সংকট নির্দিষ্ট আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় গড়ে ওঠে।

এবং শিক্ষার বর্তমান যে সংকট তাও একটি আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার ফলাফল। আর তা হলো পুঁজিবাদী অর্থনীতি।

পুঁজিবাদের শিক্ষা ব্যবস্থা মুনাফাকেন্দ্রিক। উপরন্তু তা আমলাতান্ত্রিক ও পুঁজিপতিশ্রেণীর স্বার্থকেন্দ্রিক হওয়ায় তা গণসম্পৃক্ত নয়। তাই করোনার মত হঠাৎ ধেয়ে আসা সংকট সে মোকাবেলা করতে পারে না। আবার মোকাবেলা সে ততটুকুই করতে চায় যতটুকু তার ব্যবস্থার স্বার্থে প্রয়োজন। তাই দেখা যায় করোনা পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে রাষ্ট্রগুলো একের পর এক গণবিরোধী নীতি ও সিদ্ধান্তগুলো জনগণের উপর চাপিয়ে দিচ্ছে এবং ভবিষ্যতে তা আরও বাড়বে।

এ সম্পর্কে কানাডিয়ান লেখিকা ও আন্দোলনকর্মী নাওমি ক্লেইন তার ' The shock doctrine:the rise of disaster' গ্রন্থে বলছেন, "মনুষ্যসৃষ্ট বা প্রাকৃতিক দূর্যোগকে হাতিয়ার করে রাষ্ট্র অনেক পলিসি গ্রহণ করে যা পাবলিক খাতগুলোকে বেসরকারিকরণ- বাণিজ্যিকীকরণ এর পথে নিয়ে যায়। এর মধ্য দিয়ে জনস্বার্থ বিঘ্নিত হয় ও মুনাফালোভী গোষ্ঠীর মুনাফা লাভের পথ প্রসারিত হয়। "

অন্যান্য জনসংশ্লিষ্ট খাতের সাথে শিক্ষাক্ষেত্রেও এর প্রভাব পড়বে। সামনের দিনে শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ-বেসরকারিকরণে সরকার-রাষ্ট্র অনেক বেশি তৎপর হবে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ আগের যে কোন সময়ের চেয়ে তীব্র হবে। তাই এ সময়ে এবং সামনের দিনগুলোতে শিক্ষাক্ষেত্রে সরকার যেন কোন গণবিরোধী নীতির বাস্তবায়ন করতে না পারে, সে বিষয়ে আমাদের সজাগ থাকা জরুরী। একই সাথে জরুরী দৃঢ় লড়াই গড়ে তোলার অঙ্গীকার। কারণ ইতিহাস থেকে আমরা শিখি, শাসকশ্রেণি কোন অধিকার এমনি এমনি ছেড়ে দেয় না, লড়াই করে পেতে হয়।

মায়ানমারে সেনা অভ্যুত্থান বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনে বাসদ (মার্কসবাদী)-র সংহতি

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল(মার্কসবাদী)-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী এক বিবৃতিতে মায়ানমারে সেনা অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে সেদেশের জনগণের চলমান গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সাথে সংহতি প্রকাশ করেছেন। বিবৃতিতে তিনি বলেন, "মায়ানমারের গণতন্ত্রকামী মানুষ প্রতিদিন বুকের রক্ত দিয়ে সেনাশাসনের বিরুদ্ধে লড়ছে। মায়ানমারের জনগণের মরণপণ সংগ্রাম এ অঞ্চলের নিপীড়িত মানুষকে গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের আন্দোলনে প্রেরণা যোগাবে। আমাদের দেশে ভোটডাকাতির মাধ্যমে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকার এক দশক ধরে গণতন্ত্রের মোড়কে স্বৈরাচারী শাসন কায়েম করেছে। এদেশের জনগণকেও গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ে লড়তে হচ্ছে। ফলে মায়ানমারে চলমান গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের আন্দোলনে এদেশের মানুষ সমর্থন জানায়।"

বিবৃতিতে কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী বলেন, "মায়ানমারে গত ১লা ফেব্রুয়ারী নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের বন্দী করে সেনাবাহিনীর অভ্যুত্থানের পর থেকে গণতন্ত্রকামী মানুষের বিক্ষোভ দমনে সেনাবাহিনী-পুলিশের গুলিতে এ পর্যন্ত পাঁচ শতাধিক মানুষ নিহত হয়েছে। ১৯৪৮ সালে স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকে এখন পর্যন্ত প্রায় পুরো সময় দেশটিতে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে সেনাবাহিনী ক্ষমতা দখল করে ছিল। শুধু রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই নয়, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও সেনাবাহিনী একচ্ছত্র আধিপত্য কায়েম করেছে। গণতন্ত্রের জন্য মায়ানমারের জনগণের সংগ্রাম নতুন নয়। ১৯৮৮ সালে সরকারবিরোধী আন্দোলনে কয়েক হাজার মানুষকে গুলি করে হত্যা করা হয়। একইভাবে ২০০৭ সালে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের নেতৃত্বে পরিচালিত আন্দোলনেও হত্যা-নির্যাতন চালায় সেনাবাহিনী। স্বৈরাচারী কায়দায় দেশ পরিচালনা করার স্বার্থে ও শোষণের প্রয়োজনে সেনাশাসকরা জনগণকে বিভক্ত করেছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ বামার জাতিগোষ্ঠীর সাথে কারেন, শান, রোহিঙ্গা ইত্যাদি জাতির জাতিগত দ্বন্দ্ব তীব্র করেছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ বৌদ্ধ ধর্মানুসারী মানুষের মধ্যে ধর্মীয় উন্মাদনা তৈরি করে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর নিপীড়ন চালিয়েছে। যার ফলশ্রুতিতে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর উপর বর্বর আক্রমণ করে তাদের দেশ থেকে বিতাড়িত করেছে। জনগণের আকাঙ্ক্ষার বিপরীতে দেশ পরিচালনা করতে গিয়ে সেনাশাসকরা বারবার সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর কাছে নতজানু হয়েছে। বিশেষত মায়ানমারের প্রতিবেশী বর্তমানের সাম্রাজ্যবাদী চীন তার ভূরাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক স্বার্থে সেনাশাসনকে সহযোগিতা করছে। ভারতও তার উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যসমূহে যোগাযোগ ও বাণিজ্যের স্বার্থে মায়ানমারের সেনাশাসনকে সমর্থন করে।"

কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী আরো বলেন, "২০১৭ সালে এই মায়ানমার সেনাবাহিনীর বর্বর নিপীড়নে প্রায় ১০ লক্ষ রোহিঙ্গা শরণার্থী বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়। সেনা অভ্যুত্থানের ফলে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া আরও দীর্ঘায়িত হতে পারে। কিন্তু গত ২৭ মার্চ মায়ানমারের সশস্ত্র বাহিনী দিবসের অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি উপস্থিত থাকার মধ্য দিয়ে সরকার প্রকারান্তরে সেনাশাসকদের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে।

সেখানে চীন, রাশিয়া, ভারতের মত সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর সাথে বাংলাদেশের প্রতিনিধি অংশ নেয়। এ ঘটনার মাধ্যমে বোঝা যায়, এ অঞ্চলের বিভিন্ন দেশের শাসকশ্রেণী - হোক সে মায়ানমারের সেনাশাসক, বাংলাদেশের ভোট ডাকাতির সরকার বা ভারতের ফ্যাসিস্ট মোদি সরকার - এদের মধ্যে একটা ঐক্য আছে। ফলে, ফ্যাসিবাদ বিরোধী লড়াইয়ের জন্য বিভিন্ন দেশের নিপীড়িত মানুষের ঐক্য আজ অপরিহার্য।"

সাম্যবাদ

শেষ পৃষ্ঠা

৮ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা
এপ্রিল-মে ২০২১

১৪ মার্চ সর্বহারার মহান নেতা কার্ল মার্কসের প্রয়াণ দিবসে বাসদ (মার্কসবাদী)-র শ্রদ্ধাঞ্জলি

করোনা অতিমারীর এক বছর

বিপর্যস্ত শিক্ষা ব্যবস্থা বনাম আওয়ামী সরকারের দায়িত্বহীনতা

কোভিড-১৯ এর কারণে বিপর্যস্ত আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা। অর্থাৎ ভয়ানক সংকটের সম্মুখীন শিক্ষা, শিক্ষার্থীদের সামাজিক জীবন ও শিক্ষকদের জীবন-জীবিকা। এখন প্রশ্ন, এই যে সংকট তা মোকাবেলা করার জন্য সরকার কতটুকু প্রস্তুত ছিল? সংকটের পুরো চিত্র আলোচনা না করেও বলা যায়; ন্যূনতম প্রস্তুতিও ছিলো না। গতবছর মার্চ মাসে সরকারের তরফে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ ঘোষণা করা হয়। এরইমধ্যে একবছরের অধিক সময় করোনা অতিমারী মোকাবিলা করার অভিজ্ঞতা আমাদের সঞ্চিত হয়েছে। কিন্তু সরকার শিক্ষাক্ষেত্রের সংকট মোকাবেলায় কতটুকু সক্ষমতার পরিচয় দিয়েছে বা দিচ্ছে?

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ থাকায় সংকটে পড়েছে প্রায় ৫ কোটি শিক্ষার্থীর একাডেমিক-সামাজিক জীবন। এরমধ্যে প্রাথমিক পর্যায়ে প্রায় পোনে দুই কোটি, মাধ্যমিক পর্যায়ে সোয়া কোটির কিছু বেশি এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষার্থী ১২ লাখের কাছাকাছি। এছাড়া আলিয়া মাদ্রাসা, কারিগরি, ইংরেজি মাধ্যমসহ বিভিন্ন বিশেষায়িত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়ছে ৫০ লাখের কাছাকাছি শিক্ষার্থী।

শিক্ষাক্ষেত্রের সংকট মোকাবেলায় সরকারের পক্ষ থেকে প্রয়োজন ছিলো একটি সামগ্রিক প্রস্তাবনার। প্রয়োজন ছিলো শিক্ষাবিদ-জনস্বাস্থ্যবিশেষজ্ঞ-চিকিৎসক-সমাজবিজ্ঞানীদের যুক্ত করে একটি পরিকল্পনা হাজির করা। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিলো দ্রুত ঝুঁকি নির্ণয়, মাঠ পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালুর পরিকল্পনা। এছাড়াও প্রয়োজন ছিলো নিরাপদ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিশ্চিত করতে গাইডলাইন প্রদান, হাইজিন উপকরণ ও সরঞ্জাম সরবরাহ নিশ্চিত, সংক্রমণ ও রোগ প্রতিরোধ সংক্রান্ত তথ্য প্রচার নিশ্চিত করা। আমরা জানি, করোনা অতিমারী শিক্ষার্থী-শিক্ষকদের মনস্তত্ত্বকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে; তাই প্রয়োজন ছিলো মানসিক সহায়তা নিশ্চিত করা। আমাদের অভিজ্ঞতা বলে এক্ষেত্রে কার্যকরী কোন উদ্যোগই গ্রহণ করা হয়নি।

শিক্ষা গ্রহনের প্রস্তুতিপর্ব হিসেবে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা খুব গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত। করোনায় থমকে গেছে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাপ্রদান কার্যক্রম। এ পরিস্থিতিতে একটি বড় অংশের শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ পর্ব বাঁধাগ্রস্ত হবে – একথা বলাই যায়। প্রাথমিক শিক্ষার চিত্রও ভয়াবহ। গত বছরের তুলনায় এ বছর এক-তৃতীয়াংশ শিক্ষার্থী ভর্তি হয়নি। (দৈনিক কালের কণ্ঠ ২৩ জানুয়ারি'২১) এরই মধ্যে ঝরে পড়েছে এবং ঝরে পড়ার আশঙ্কায় রয়েছে বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী। একটি বেসরকারি সংস্থার গবেষণা অনুযায়ী, প্রায় ৪০ শতাংশ শিশু শিক্ষা-গ্রহণ প্রক্রিয়া থেকে ঝরে পড়বে। বিশেষ করে শহরের বস্তিবাসী এবং হাওর অঞ্চলের শিশুরাই বেশি ঝরে পড়বে। কেননা করোনার কারণে এসব পরিবারে দারিদ্র্য আগের চেয়ে বেড়েছে। এমনকি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুললেও একটা বড় সংখ্যক শিক্ষার্থী ক্লাসরুমে নিয়মিত উপস্থিত থাকতে পারবে না।

সম্প্রতি পাওয়ার অ্যান্ড পার্টিসিপেশন রিসার্চ সেন্টার (পিপিআরসি) এবং ব্র্যাক ইনস্টিটিউট অব গভর্ন্যান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (বিআইজিডি)-এর গবেষণা অনুযায়ী – এসময় শহরের নিম্ন আয়ের মানুষের আয় কমেছে ৮২ শতাংশ এবং গ্রামাঞ্চলের ৭৯ শতাংশ। পরিস্থিতির শিকার হয়ে শিক্ষার্থীদের একটা বড় অংশকে বিভিন্ন আয়মূলক কাজের সাথে যুক্ত হতে হয়েছে। তাই বলা যায়, সাধারণ মানুষের সংকট থেকে শিক্ষার্থীদের সংকট বিচ্ছিন্ন নয় বরং গভীরভাবে সম্পর্কিত। কারণ এই শিক্ষার্থীরা পরিবারে বাস করে। কৃষক কিংবা শ্রমিক বাবা তার কাজ হারালে, আর্থিক অনিরাপত্তা তৈরি হলে একজন শিক্ষার্থী বিচ্ছিন্নভাবে শিক্ষার স্বপ্ন দেখবে কীভাবে? এ ভাবনা কি সরকারের আছে? করোনাকালে আর্থিক-সামাজিক অনিরাপত্তা তৈরি হওয়ায় বাল্য বিবাহের সংখ্যাও বাড়ছে। বিশেষ করে মেয়ে শিশুদের বই-খাতা ছেড়ে বিয়ের পিঁড়িতে বসতে বাধ্য করা হচ্ছে। এভাবেই শিক্ষাব্যবস্থার সংকটের মধ্যে পড়ে শিক্ষার্থীরা বহুমাত্রিক সামাজিক সহিংসতা-নিপীড়নের শিকার হচ্ছে।

করোনার শুরুর দিকে সরকার সংসদ টেলিভিশন এর প্রোগ্রাম 'আমার ঘর, আমার স্কুল' এবং মোবাইল ফোন ব্যবহার করে শিক্ষা কার্যক্রম চালুর উদ্যোগ নেয়। কিন্তু সামগ্রিক পরিকল্পনার অভাব ছিলো সুস্পষ্ট। প্রান্তিক অঞ্চলের শিক্ষার্থীদের টেলিভিশন সেট এবং মোবাইল ডিভাইস-ইন্টারনেট সংযোগ না থাকায় মাত্র ১৬ শতাংশ শিক্ষার্থী এতে উপস্থিত থাকতে পেরেছে। (দৈনিক সমকাল , ২৬ জুন '২০)

পরিবারগুলোর আয় কমলেও স্কুল-কলেজ কর্তৃপক্ষের তরফে বেতন-ফি আদায় থেমে নেই। শুধুমাত্র অনলাইন ক্লাস করিয়েই আদায় করা হচ্ছে পুরো বেতন। অভিভাবকদের ফোন করে টাকা আদায় চলছে। এমনকি বেতন না দেয়ায় অনলাইন ক্লাস বন্ধ করে দেয়া এবং শিক্ষার্থীদের স্কুল থেকে নাম কেটে দেয়ার মত ঘটনাও ঘটেছে। এই যখন অবস্থা তখন, মাধ্যমিক এবং উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক সৈয়দ গোলাম মো. ফারুক বলেন, "আর বেতন নিয়ে যে সমস্যা তা স্কুল কর্তৃপক্ষ ও অভিভাবকরা মিলে যৌথ আলোচনার মাধ্যমে সমাধান বের করার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে ।... এ ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এর বাইরে কোনো ভূমিকা নেবে না।" (ডয়েচে ভেলে বাংলা, ২১ সেপ্টেম্বর'২০) এ মন্তব্য থেকেই শিক্ষা এবং শিক্ষার্থীদের প্রতি সরকার এবং এর কর্তাব্যক্তিদের মনোভাব বোঝা যায়।

করোনার প্রভাবে উচ্চ শিক্ষায় কিছু মাত্রায় স্থবিরতা, কিছু মাত্রায় বিশৃঙ্খলা বিরাজ করছে। প্রাথমিকভাবে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অনলাইন ক্লাস চালুর মধ্য দিয়ে শিক্ষা কার্যক্রম চালু রাখা হয়। কিন্তু এ নিয়ে সামগ্রিক পরিকল্পনা না থাকায় গ্রামে, পাহাড়ি অঞ্চলে বা আর্থিকভাবে অসচ্ছল শিক্ষার্থীরা এসব ক্লাসে অংশ নিতে পারেনি। বাস্তবে প্রায় অর্ধেক শিক্ষার্থীই এতে অনুপস্থিত ছিলো। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন যাদের ডিভাইস নেই তাদের ঋণ দেয়ার কথা বলে। অবস্থা দেখে মনে হয়, বিশ্ববিদ্যালয় মহাজনী প্রতিষ্ঠান আর প্রশাসন সুদখোর মহাজন। শুরুতে বলা হয়, অনলাইন ক্লাসের ভিত্তিতে কোন পরীক্ষা নেয়া হবে না। শুধুমাত্র ছাত্রদের শিক্ষাকার্যক্রমে যুক্ত রাখা এবং মানসিক অবসাদ থেকে মুক্ত রাখার জন্যই অনলাইন ক্লাস নেয়া হবে। কিন্তু পরবর্তী সময়ে আমরা দেখলাম, মিডটার্ম-ইনকোর্স এমনকি বহু বিভাগে ফাইনাল পরীক্ষা পর্যন্ত নেয়া হয়েছে। যদিও এসব পরীক্ষায় বহু শিক্ষার্থী অর্থনৈতিক-সামাজিক-মানসিক কারণে অংশ নিতে পারেনি। এরা মূলত গ্রামাঞ্চলের এবং আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল পরিবারের। এসব শিক্ষার্থী একাডেমিকভাবে পিছিয়ে পড়ছে।

● ৭ এর পাতায় দেখুন

> করোনার প্রভাবে উচ্চ শিক্ষায় কিছু মাত্রায় স্থবিরতা, কিছু মাত্রায় বিশৃঙ্খলা বিরাজ করছে। প্রাথমিকভাবে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অনলাইন ক্লাস চালুর মধ্য দিয়ে শিক্ষা কার্যক্রম চালু রাখা হয়। কিন্তু এ নিয়ে সামগ্রিক পরিকল্পনা না থাকায় গ্রামে, পাহাড়ি অঞ্চলে বা আর্থিকভাবে অসচ্ছল শিক্ষার্থীরা এসব ক্লাসে অংশ নিতে পারেনি। বাস্তবে প্রায় অর্ধেক শিক্ষার্থীই এতে অনুপস্থিত ছিলো

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন বাতিলের দাবিতে প্রগতিশীল ছাত্রসংগঠনসমূহের আন্দোলনে পুলিশি হামলা-বাঁধা

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন বাতিলের দাবিতে প্রগতিশীল ছাত্রসংগঠনসমূহের আন্দোলনে পুলিশি হামলা বাঁধা

জেল কাস্টডিতে লেখক মুশতাকের মৃত্যুর পর বাম ছাত্র সংগঠনগুলোর নেতৃত্বে লাগাতার বিক্ষোভের এক পর্যায়ে ২৬ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যার মশাল মিছিলে পুলিশ নির্মমভাবে হামলা করে অর্ধশতাধিক নেতাকর্মীকে আহত করে। মিছিল থেকে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সদস্য আরফাত সাদ এবং বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের ৬ নেতাকর্মীকে গ্রেপ্তার করে। লেখক মুশতাকের মৃত্যু এবং ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে সাংবাদিক-লেখক-শিক্ষক-রাজনৈতিক কর্মীদের গ্রেপ্তার নিয়ে সারাদেশ যখন বিক্ষুব্ধ, এরই মধ্যে খুলনার শ্রমিক নেতা রুহুল আমিনকে এই কালো আইনে গ্রেপ্তার করা হয়।

দেশে ভোট-ডাকাতির মাধ্যমে গায়ের জোরে ক্ষমতায় আসা আওয়ামী লীগ সরকার ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মতো একটি অগণতান্ত্রিক ও নিপীড়নমূলক আইন করে মানুষের মতপ্রকাশের অধিকারকে হরণ করছে। যখন-তখন অন্যায়ভাবে লেখক, কার্টুনিস্ট, ছাত্রনেতা, শ্রমিকনেতাদেরকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। কারাগারে দীর্ঘদিন নির্যাতনের ফলে লেখক মুশতাকের মৃত্যু এই সরকারের ফ্যাসিবাদী চরিত্রকে উন্মোচিত করে। আন্দোলনকে ভয়ের চোখে দেখছে সরকার। কিন্তু এভাবে দমন-পীড়ন করে মানুষের আন্দোলনকে দমিয়ে রাখা যায় না। এই আন্দোলন চলবে।

সাম্রাজ্যবাদী ভারতের শোষণ ও ফ্যাসিস্ট নরেন্দ্র মোদির সফরের প্রতিবাদে প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠনসমূহের আন্দোলন

বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে ভারতের ফ্যাসিস্ট-সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাবাজ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আগমনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সবচেয়ে সরব ছিল দেশের বামপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলো। তাদের ধারাবাহিক প্রতিবাদের স্ফূলিঙ্গ পরবর্তীতে ছড়িয়ে পড়ে সারাদেশে। নরেন্দ্র মোদির আগমনের প্রতিবাদে প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠনসমূহ ১৮ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিনে এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে ১৯ মার্চ বিক্ষোভ মিছিল এবং ২৫ মার্চ মশাল মিছিল কর্মসূচী ঘোষণা করে। এ কর্মসূচী ঘোষণার পরপরই মোদির এদেশীয় দোসর ফ্যাসিস্ট আওয়ামী সরকারের গুন্ডা বাহিনী ছাত্রলীগের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি বাম ছাত্র সংগঠনের কর্মীদের 'কলিজা ছিঁড়ে' নেয়ার হুমকি দেয়। ছাত্রলীগ এবং পুলিশের উপর্যুপরী হুমকি উপেক্ষা করে ১৯ মার্চ প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠনগুলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ সারাদেশে বিক্ষোভ মিছিল করে। পরবর্তীতে ২৩ মার্চ প্রগতিশীল ছাত্র জোট নরেন্দ্র মোদির কুশপুত্তলিকা দাহ করতে গেলে ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা ব্যাপক হামলা চালায়। হামলায় সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় সভাপতি মাসুদ রানা, সাধারণ সম্পাদক রাশেদ শাহরিয়ার, ঢাবি শাখার সহসভাপতি সাদিকুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক প্রগতি বর্মণ তমা, ছাত্র ইউনিয়ন নেতা মেঘমল্লার বসু, আসমানী আশা সহ প্রায় ২৫ নেতাকর্মী আহত হয়। এর মধ্যে প্রগতি বর্মণ তমার মাথা ফেটে যায়। এর প্রতিবাদে ঢাকাসহ সারাদেশে তাৎক্ষণিক বিক্ষোভ হয়। এরপর ২৫ মার্চ সন্ধ্যায় প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠনসমূহ পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী মশাল মিছিল করে। সেদিনও মশাল মিছিল শেষে নেতাকর্মীরা যখন ফেরত যাচ্ছিল তখন ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা আবারও হামলা চালায়। হামলায় গণতান্ত্রিক ছাত্র কাউন্সিলের সাধারণ সম্পাদক উজ্জ্বল বিশ্বাসসহ অনেকে আহত হয়। ২৫ মার্চ সারাদেশে বামজোটের মোদি বিরোধী কর্মসূচী থেকে পুলিশ অনেক নেতাকর্মীদের গ্রেফতার ও হামলা করে। এসকল হামলা গ্রেফতার এবং মোদির আগমনের প্রতিবাদে স্বাধীনতা দিবসেও প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠনসমূহ ঢাকা কেন্দ্রীয় প্রেসক্লাবের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ করে। প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠনের নেতাকর্মীরা ফ্যাসিস্ট আওয়ামী সরকারের হামলা-গ্রেফতার-হুমকি উপেক্ষা করে সাম্রাজ্যবাদের প্রতিনিধি ফ্যাসিস্ট সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাবাজ নরেন্দ্র মোদির আগমনের বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে লড়েছে।

ভারতীয় নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকার ভারতের পুঁজিপতি শ্রেণীর বর্তমানকালের বিশ্বস্ত প্রতিনিধি, যারা ভারতের জনগণকে শোষণের পাশাপাশি সমগ্র দক্ষিণ

● ৭ এর পাতায় দেখুন

সম্পাদনা পরিষদের সভাপতি ***মুবিনুল হায়দার চৌধুরী***, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) কর্তৃক ২২/১ তোপখানা রোড (৬ষ্ঠ তলা), ঢাকা–১০০০ থেকে প্রকাশিত।
ফোন ও ফ্যাক্স–৯৫৭৬৩৭৩। ওয়েবসাইট : www.spbm.org; ই–মেইল : mail@spbm.org